ধান

মোঃ ইফতেখার আলী



রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ



ধান

মোঃ ইফতেখার আলী



RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

ধান **Rice**

মোঃ ইফতেখার আলী **Md. Iftekhar Ali**

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০১৯ **Published in:** December, 2019

প্রকাশনায়:
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
বাসা ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোনঃ (+৮৮০-২) ৯৮২০০৫১-২
Email: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

Published by:
Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
House 07 (Kajoli), Road 17, Block C,
Banani, Dhaka- 1213, Bangladesh
Phone: (+880-2) 9820051-2
E-mail: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

সহায়তায়:
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্টুং
ফ্রাঞ্জ-মেহ্রিং-প্লাটজ্ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
Website: www.rosalux.de/en/

Supported by:
Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Website: www.rosalux.de/en/

মুদ্রণে:
ফেমাস প্রিন্টিং
খ-১১৫/৬, জামতলা, নিকুঞ্জ-২
রোড-১, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯

Printed by:
Famous Printing
Kha-115/6, Jamatala, Nikunja-2
Road-1, Khlkhet, Dhaka-1229

প্রচ্ছদ, ফ্রন্ট ইন এবং ৫, ৭, ২২, ৪২, ৫০ ও ৫১ পৃষ্ঠার ছবি : হাফিজ আসাদ
অন্যান্য ছবি : লেখক

Picture: Cover, front in and page no. 5, 7, 22, 42, 50, 51 by Hafiz Asad.
Others: Author

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung e.V. with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany

মুখবন্ধ

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (আরএলএস)-এর সহায়তায় ২০১৭ সাল থেকে "প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশ: শিক্ষণ এবং গণগবেষণা" নামে একটি প্রকল্পে কাজ করছে। প্রকল্পটির বিষয়বস্তু কৃষি, কৃষি-প্রতিবেশ, কৃষক সমাজ, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব, নিরাপদ খাদ্য প্রভৃতি। প্রকল্পটির কাজের উদ্দেশ্য উল্লেখিত বিষয়-সম্পর্কিত জ্ঞানের অন্বেষণ ও কৃষক সমাজে এর চর্চা করা। রিইব মূলত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একশন রিসার্চের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। সেই সাথে প্রকাশনার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়াও রিইব-এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপর মালিকানা একটি সামাজিক শক্তি। আজকে বিশ্বে আধুনিক প্রযুক্তির যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং আমাদের কৃষক সমাজ শিক্ষা ও প্রযুক্তির যে স্তরে রয়েছে তাতে জ্ঞান-সম্পর্ক অনেক বেশি অসম হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে তার নানাবিধ অধিকার এবং দেশ ও বিশ্ব কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে সচেতন করাই তার উন্নয়নে সহায়তা করার প্রথম পদক্ষেপ। রিইব জ্ঞানের এই অসমতা কমিয়ে আনা এবং কৃষকের মাঝে জ্ঞানকে পৌছে দেবার লক্ষ্যে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখা-লেখি ও তথ্য বাংলায় প্রকাশ করছে এবং সেসব প্রকাশনা গণগবেষণা দলে এবং স্থানীয় স্কুলে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছে, এই জ্ঞানকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে।

'কৃষি প্রতিবেশ' বিষয়টি যখন থেকে মানুষ ভূমি কর্ষণ করা শুরু করেছে তখন থেকেই শুরু। বৈশ্বিক পরিসরে শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত এর এক ধরনের ঐতিহ্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে প্রযুক্তি যত বেশি প্রসারিত হয়েছে প্রতিবেশ তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে বৈশ্বিক রাজনীতির কারণে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো যে ধরনের প্রতিবেশগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই ক্ষতিগুলো যে কৃষকদের সরাসরি প্রভাবিত করছে তাকে তুলে ধরা এবং এই সংক্রান্ত জ্ঞান কৃষক ও অন্যদের সাথে বিনিময় করা এসব বই প্রকাশনার উদ্দেশ্য।

রিইব আরও মনে করে, রাষ্ট্রীয় পরিসরে বিভিন্ন সেক্টরে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে যারা কাজ করছেন তাঁদের কাছেও আমাদের এই বক্তব্যগুলো তুলে ধরতে হবে যাতে নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুস্থায়ী কৃষি পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হতে পারে। রিইব তাই সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে আগ্রহী। এই সম্মিলিত প্রয়াস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত করবে তেমনি জনগণের কাছে নিরাপদ খাদ্য পৌছে দেবার চেষ্টায় জ্ঞান উৎপাদন করবে।

এক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে যাতে এই ধরিত্রীর প্রতিবেশ সুস্থ থাকে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য থাকে। সেই লক্ষ্যে রিইব এর ক্ষুদ্র প্রয়াস এইসব প্রকাশনা।

শামসুল বারি
চেয়ারম্যান, রিইব।

অবতরণিকা

২০১৯ সালের মে মাসে টাঙ্গাইলের কৃষক আবদুল মালেক সিকদার নিজের পাকা ধানক্ষেতে আগুন লাগিয়ে প্রতিবাদ জানান। তার প্রতিবাদের কারণ উৎপাদন খরচের তুলনায় ধানের বাজারদর কম। কৃষকরা প্রায় প্রতি বছরই এই সংকটের মোকাবেলা করেন। তবে এবার খবরের কাগজে বোরো ধানের ক্ষেতে আগুন দেওয়ার ঘটনা ছাপা হলে কৃষি থেকে ক্রমে আরও দূরে সরতে থাকা শহরবাসীরাও আৎকে উঠেন। বিভিন্ন এলাকার ধানচাষীদের সাথে কথা বলে জানা যায় ধান নিয়ে তারা উভয় সংকটে আছেন। একদিকে ব্লাস্ট রোগ বা কারেন্ট পোকার (বাদামি ঘাস ফড়িং) হঠাৎ আক্রমণে ক্ষেতের ধান নিমেষেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আবার যদি কোন বালাই না হয়, অর্থাৎ ধানের বাম্পার ফলন হয়, তাহলেও লাভজনক দাম পাওয়া যায় না।

ধানের সাথে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি গভীরভাবে জড়িত। বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষি জমিতেই ধান চাষ করা হয়। কিন্তু ধান বিষয়ক ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান বিলুপ্তির পথে। শহরের অধিকাংশ মানুষ এখন ধান বলতে বুঝেন মিনিকেট চাল, আর গ্রামে অনেক কৃষকেরই ধারণা রাসায়নিক সার ও বিষ ছাড়া ধান চাষ সম্ভব নয়। আবার বাংলাদেশে বহুল আলোচিত গোল্ডেন রাইস অনুমোদন দেওয়ার জন্যও কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। তাই বিভিন্ন পরিসরে ধান বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। ধানের সাথে কিভাবে কৃষকের স্বার্থ, খাদ্য সার্বভৌমত্ব, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য জড়িত তা নিয়ে আলাপ এখন সময়ের দাবি। এই পুস্তিকায় ভূমিকা, ধানের জাত বৈচিত্র্য, ধানগুলো সব গেলো কোথায়, ধান চাষের সমস্যা, জিন প্রকৌশলজাত ধান, ধানের পুষ্টি ও অন্যান্য ব্যবহার, জীববৈচিত্র্য নির্ভর ধান চাষ ও বালাই ব্যবস্থাপনা এবং উপসংহার অধ্যায়ে ধানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বইটি লেখার জন্য ধান ও ধান চাষ বিষয়ক বই, গবেষণা প্রতিবেদন, খবরের কাগজের প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া কৃষক এবং কৃষিবিদদের সাথে আলাপের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আশা করা যাচ্ছে কৃষক, ভোক্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, খাদ্য/কৃষি/কৃষক-অধিকার নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ, একটিভিস্ট, নীতি-নির্ধারক ও শিক্ষার্থীরা এই বই এর মাধ্যমে ধানের বিভিন্ন বিষয়সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং নিজের কাজে প্রয়োগ করতে পারবেন।



ভূমিকা

ধান পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য শস্য। ধান থেকে পাওয়া যায় চাল, যেটি পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষের প্রধান খাদ্য।[১] একশটিরও বেশি দেশে ধান চাষ করা হয় এবং বছরে সত্তর কোটি টনের বেশি ধান উৎপাদন হয়। তবে এশিয়া মহাদেশেই মোট ধানের প্রায় ৯০ ভাগ উৎপাদিত হয় এবং ৮৭ ভাগ খাওয়া হয়।[২] আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান এবং লাটিন আমেরিকাতেও প্রধান খাদ্য হিসেবে চালের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। ২০১৬ সালে বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৪.৪ কোটি কৃষক পরিবার (পৃথিবীর মোট কৃষক পরিবারের ২৫%) ৪০০ কোটি মানুষের (মোট জনসংখ্যার ৫৬%) খাওয়ার জন্য ৩৮.৮ কোটি একর জমিতে (মোট শস্য ক্ষেতের ৮%) ৭৪ কোটি টন ধান উৎপাদন করেছিলেন (মোট দানাশস্যের ৩০%), যার আর্থিক মূল্য ২০,৬০০ কোটি মার্কিন ডলার (মোট শস্য মূল্যের ১৩%) এবং এই ধান চাষ করতে ২.৭ কোটি টন সার (মোট প্রয়োগকৃত সারের ১৫%) ও ৪৪০ কিমি^{3} সেচের পানি (মোট সেচের পানির ৩৫%) প্রয়োগ করা হয়েছিল।[৩]

সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন হয় যথাক্রমে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ফিলিপাইন, ব্রাজিল ও জাপানে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে দেশে ধান চাষ হয়, সে দেশেই খাওয়া হয়। উৎপাদিত ধানের মাত্র সাত ভাগের মত আন্তর্জাতিক বাজারে কেনাবেচা করা হয়। ২০১৮ সালে চাল রপ্তানি করে সবচেয়ে বেশি আয় করেছে ভারত (আন্তর্জাতিক চাল রপ্তানির ৩০.১%), থাইল্যান্ড (২২.৭%),

ভিয়েতনাম (৯%), পাকিস্তান (৮.২%) ও যুক্তরাষ্ট্র (৮.২%) ।[৪] আর সবচেয়ে বেশি টাকার চাল আমদানি করেছিল চীন (আন্তর্জাতিক চাল আমদানির ৬.৫%), ইরান (৪.৯%), সৌদি আরব (৪.৯%), ইন্দোনেশিয়া (৪.২%) ও যুক্তরাষ্ট্র (৩.৯%) ।[৫]

এশিয়ার পাকিস্তান থেকে জাপান পর্যন্ত অঞ্চল ধান চাষের জন্য প্রসিদ্ধ । প্রাচীকাল থেকেই ধান এখানে মানব সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ । এই অঞ্চলের সাহিত্য, চিত্রকলা, আচার, উৎসব, জীবনযাপনের সাথে মিশে আছে ধান । ধান থেকে হয় চাল, আর চাল থেকে ভাত এবং নানান খাবার ও পানীয় । এশিয়ার কয়েকটি ভাষাতে ভাত ও খাদ্য একে অপরের প্রতিশব্দ ।[৬] যেমন জাপানে সকালের, দুপুরের ও রাতের খাবারকে যথাক্রমে সকালের, দুপুরের ও রাতের ভাত বলা হয়; সংস্কৃত ভাষায় 'অন্ন' মানে ভাত বা খাবার; চীন ও বাংলাদেশে অতিথি আপ্যায়নের জন্য জিজ্ঞেস করা হয় "আপনি কি ভাত খেয়েছেন?" ।[৭] ধান চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের সাথে অনেক মানুষের জীবন ও কর্মসংস্থান জড়িত । এশিয়ার অধিকাংশ দেশের সরকারেরই লক্ষ্য থাকে চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকা, কারণ সুলভ মূল্যে চালের সুস্থায়ী যোগানের সাথে ক্ষমতায় টিকে থাকা ও সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে ।[৮]

ধানের বৈজ্ঞানিক নাম *Oryza sativa* । ধানের তিনটি ভিন্ন শ্রেণি: ইন্ডিকা, জ্যাপোনিকা ও জ্যাভানিকা; যাদেরকে উপ-প্রজাতি বা ইকোটাইপ বলা হয় । তবে ভারতীয় উপমহাদেশে আবাদ করা হয় 'ইন্ডিকা' শ্রেণির ধান, যার বৈজ্ঞানিক নাম ওরাইজা স্যাটিভা ইন্ডিকা (*Oryza sativa var. indica*) ।

এ দেশের কৃষক সমাজ আদিকাল বিভিন্ন রকম ধানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে ধান চাষের তিনটি মৌসুম ঠিক করেছিলেন ঃ আউশ (বৈশাখ - শ্রাবণ), আমন (শ্রাবণ - অগ্রহায়ণ) ও বোরো (অগ্রহায়ণ - চৈত্র) ।





ধানের জাতবৈচিত্র্য

ধান পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ দানা শস্য। ধানের জাতের সঠিক সংখ্যার হিসাব করা কঠিন, তবে এখন পর্যন্ত এক লক্ষ চল্লিশ হাজার জাতের কথা জানা গেছে।[৯] ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জিন ব্যাংকে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার রকম ধানের জিন সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সবুজ বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতে ৪২,০০০ এরও বেশি জাতের ধান চাষ হত।[১০] প্রায় ৮০ বছর আগে ধান বিজ্ঞানী ডক্টর হেক্টর এদেশে বিভিন্ন মৌসুমে স্থানীয় জাতের সংখ্যা ১৮,০০০ বলে উল্লেখ করেছিলেন। গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) জিন ব্যাংকে আট হাজারের অধিক ধানের জার্মোপ্লাজম সংরক্ষিত আছে।[১১] যদিও এসব জিন ব্যাংকে রক্ষিত অধিকাংশ ধান বীজের স্বাভাবিক স্ফুরণ ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। যাই হোক কিভাবে একটি মাত্র শস্যের এত জাত সৃষ্টি হলো তার অনুপম বর্ণনা ইন্ডিয়ান পরিবেশ বিজ্ঞানী ও ধান সংরক্ষক দেবল দেব-এর "লুঠ হয়ে যাই স্বদেশভূমি" বইতে পাওয়া যায়:

> "স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ উদ্ভাবনী নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর অনবদ্য নির্বাচনশৈলীর দ্বারা সৃজন করেছে একটি তৃণশস্যের অভাবনীয় বৈচিত্র্য, যার অস্তিত্ব গোড়ায় ছিলই না। ধান গাছ কৃষির আয়ত্তে আসবার পরই এর বিচিত্র জাতের সৃষ্টির সূচনা। .. ধানের যে চেহারা আমরা আজ দেখছি, সেটা ধান গাছের মনুষ্যকৃত নির্বাচনশৈলীর সঙ্গে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সংযুক্ত ফল। হাজার হাজার বছর ধরে এদেশের নাম-না-জানা অগণিত কৃষক ধানের আদিম কোনও জাত থেকে পছন্দ মতন

নানা বৈশিষ্ট্য বাছাই করে নতুন নতুন অজস্র জাতের ধান সৃষ্টি করেছেন। সুদীর্ঘকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে উদ্ভুত এই সব ধানগুলি একেক ধরনের জমিতে ফলনের উপযোগী। শুকনো উঁচু জমি, বন্যাপ্লাবিত নাবাল জমি, বৃষ্টি-ধোয়া মাঝারি জমি, প্রতিটির উপযোগী হরেক জাতের ধান আমাদের চাষীরা ফলিয়ে থাকেন। ঠিক তেমনি খরা, অতিবৃষ্টি, অকালবর্ষণ, অতিরিক্ত ঠান্ডা ইত্যাকার আবহাওয়ার নানান খামখেয়ালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া নানান জাতের ধানও এদেশে ফলছে। .. জোয়ারের নোনা জলে ধোয়া লবণাক্ত জমিতে ফলন দেয় এমন ধানও আছে সুন্দরবন অঞ্চলে। হিমাঙ্কের চার ডিগ্রী নিচে, তুষারপাতের মধ্যেও দিব্যি ফলন দেয়, তুষারসহ এমন ধানও আছে দার্জিলিং হিমালয়ে। খরাপ্রবণ এলাকায়, যেখানে সেচের কোনও সুযোগ নেই, সেখানে ঢালু উচু জমিতেও বেশ কয়েক জাতের ধান চাষ হয়। দক্ষিণ বাংলার বারমেসে জলাজমিগুলোতে কয়েক জাতের ধান ফলে যেগুলোর শীষ দশ ফুট গভীর জলের উপরিতলের আরো ফুট দুয়েক উপরে আন্দোলিত হয়।

.. ধানগাছের বিভিন্ন রোগ ও পোকা প্রতিরোধী বংশগত গুণগুলিকে চাষীরা চিহ্নিত করে, প্রতিরোধী গুণের বীজগুলিকে বাছাই করে, একেকটি জাতের ধান সৃষ্টি করেছেন। .. আমাদের হাজার হাজার দেশী জাতের ধানের মধ্যে হরেক রকমের বংশগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যার ফলে এক এক জাতের ধান একেক রকমের রোগ-পোকা-জলবায়ু, জমির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিকে থাকতে পারে। .. আদি কৃষককূল যে ধানের নানান জাত বাছাই করেছিল, সেটা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিভিন্নতার উপযোগী করে ফসল উৎপাদনের কারণেই নয়। রসনার মজা ও নান্দনিক তৃপ্তিও কারণ। সুন্দর, সরু চালের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল সীতাশাল, রূপশাল, বাঁশকাঠি ধান। সুস্বাদু অন্নের জন্য কয়া, বকুলফুল, মধুমালতী, ঝিঙেশাল। অপরূপ খৈ এর জন্য কনকচূড়, বিন্নি, ভাসামানিক, লক্ষীচূড়া। চমৎকার মুড়ির জন্য রঘুশাল, লাল ঝুলুর, চন্দ্রকান্ত, মুর্গিবালাম। .. এবং তালিকাটি এখানেই শেষ নয়।"[১২]

এই যে এত এত রকমের ধানের জাত আমাদের কৃষকগণ বাছাই করেছেন, এগুলোর প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদ নাম আছে। অধ্যাপক মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া ধানের নামকরণ বিষয়ে লিখেছেন:

"কত ভাবেইনা এক একটি জাতকে অন্য জাত থেকে নানা রকম নামের মাধ্যমে আলাদাভাবে চেনাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কখনও অতি প্রিয় জাতটিকে অতি আদরের নাম দিয়ে অন্য জাত থেকে আলাদা করা হয়েছে। ..নানা বর্ণের ধানকে বোঝাবার জন্য নানা রকম উপমা উৎপেক্ষার মাধ্যমে নামকরণ করা হয়েছে। ফুলের নাম, ফলের নাম, নানা রকম ফসলের নাম কিংবা অন্য ফসলের জাতের নামের সাথে মিল রেখে রাখা হয়েছে কত ধানের জাতের নাম। ঋতুর নাম, বস্তুর নাম, মাছের নামেও রাখা হয়েছে কোন কোন ধান জাত। সবজির নাম আর পাখির নামও বাদ যায়নি। পশুর নাম জুড়ে দিয়ে রাখা হয়েছে কত জাতের নাম। বাদ যায়নি নদীর নামও। অনেক ধান জাত রয়েছে যাদের নামকরণ করা হয়েছে স্থানের নাম অনুসারে। হুবহু মানুষের নাম দিয়েই হয়েছে কোন

কোন জাতের নাম। বীজের আকৃতি বোঝাতেও নামকরণ করা হয়েছে কোন জাতের। এমনকি বারের নামও বাদ যায়নি নামকরণে। সংখ্যা দিয়েও নামকরণ করা হয়েছে কোন কোন ধান জাতের। ধানী মৌসুমের নাম জুড়ে দিয়েও হয়েছে কোন কোন জাতের নাম। কোন কোন দেশী ধানের জাতের নাম এত চমৎকার যে বার বার এদের নাম উচ্চারণ করতে ইচ্ছে করে। কোন কোন নাম এত সুন্দর আর অর্থবহ যে আমাদের পূর্ব পুরুষদের নান্দনিকতাবোধ আমাদের অবাক করে।"[১৩]

অধ্যাপক রশীদের লেখা বই "ফসলের জীববৈচিত্র্য ও জিন সম্পদ" থেকে কিছু দেশী জাতের ধানের নাম নীচে তুলে ধরা হলো[১৪] :

বর্ণের নামে: কালা সোনা, কালো কুমারী, কালা ষাইট্টা, ধলা ষাইট্টা, সাদা কলম, সিঁদুর কোটা কিংবা কৃষ্ণজিরা
ফুলের নামে: নয়নতারা, বাঁশ ফুল, সূর্যমূখী, কামিনী, মরিচ ফুল, কদম ফুল ইত্যাদি
ফলের নামে: লিচু, জামরুল, ডুমুর, বাদাম, মরিচ পাল, নারিকেল বেদি, খেঁজুর ঝোপা ইত্যাদি
ফসলের নামে: হাসি কুমড়া, মরিচা ডুলি, কাঁচা হলুদ, এলাচী, বাদাম, তিল বাযাল, খৈয়া মটর ইত্যাদি
গাছের নামে: বট, পাথর কুচি, বাঁশ পাতা, কেওড়া ইত্যাদি
মাছের নামে: কৈঝুরি, রুই, কইয়াবোরো ইত্যাদি
পশুর নামে: গয়াল, বকরি, মহিষ পাল, হরিণ কাজলি, শিয়াল লেজী ইত্যাদি
পাখির নামে: ঘুঘু শাইল, চড়ুই, ময়না, মাছরাঙ্গা, বকফুল ইত্যাদি
স্থানের নামে: বটেশ্বর, ময়নামতি, ভাউয়াল, হাতিয়া, ফরাসডাঙা, লক্ষীপুরা ইত্যাদি
মানুষের নামে: ফুলমতি, মইরম, মানিক মোড়ল, কাঞ্চন বিবি, কামাই মল্লিক ইত্যাদি
নদীর নামে: গঙ্গাসাগর, মধুমতি ইত্যাদি।
মাসের নামে: আশ্বিনা, কার্তিক দুল, বৈশাখী, চৈতা ইত্যাদি
কার ভোগে লাগে: ঠাকুর ভোগ, দয়াল ভোগ, বাদশাহ ভোগ, সুলতান ভোগ, গোপাল ভোগ, রসুল ভোগ ইত্যাদি
গুণকীর্তন: রাধুনি পাগল, বৌ সোহাগী, জামাই নাড়ু, বৌ পাগলা ইত্যাদি
অন্যান্য: বাইশ বিশ, নি, হিঞ্চি, হূড়া, রাঙ্গী, হরি, হুকুলি, বুখি, কামোদ, লামা, আচর, উরি, বাচা, বেঙ্গী, বেতাক, সমূদ্রফেনা, মধুমালা, জলকুমারী, ঝড়াবাদল, মধুমালতী, আয়না মহল, চাঁদমনি, ময়ুরকণ্ঠি, হাসিকলমি, লক্ষীলতা, দুলাল, লক্ষীবিলাস, দুধসাগর, চন্দ্রহার, চালাকি, বৌ পালানী ইত্যাদি।

নানা কারণে ধীরে ধীরে জলাভূমি ভরাট হয়ে গেলেও, নদীমাতৃক বাংলাদেশে একমসয় বর্ষাকালে চারিদিক পানিতে থৈ থৈ করতো। এই জলামগ্ন পরিবেশ উপযোগী এক প্রকার বিশেষ ধানের উৎপত্তি হয়েছে। ড. রশীদের লেখনীতে জলি ধানের (বোনা আমন, জলী আমন, জলা ধান, বাওয়া ধান কিংবা গভীর পানির ধান) বর্ণনা পাওয়া যায়:

"বর্ষাকালে এখানে কৃষকের জমি চলে যেত পানির নিচে বেশ কিছু দিনের জন্য। এরকম থৈ থৈ করা জলজ পরিবেশ উপযোগী এক প্রকার ধান মানুষ বাছাই করে নিয়েছিল। এসব ধান জলজ পরিবেশে

সহজেই বেঁচে থাকতে পারতো। আর পানি বাড়ার বাড়ার সাথে সাথে এদের ছিল লম্বা হবার আশ্চর্য ক্ষমতা। .. জলি ধান একেবারেই আমাদের নিজস্ব সম্পদ। এদেশের কাঁদা-জল মিলে যে পরিবেশ এর মাধ্যমেই এদের উৎপত্তি ঘটেছে। এগুলো কোন ধার করা ফসল বা জাত নয়। এদেশের কৃষকের হাতের ছোঁয়ায় এরা বুনো দশা থেকে ফসলের মর্যাদা পেয়েছে, নানা রকম জাত হিসেবে কৃষকের জাতের ভান্ডারে জমা হয়েছে। জলাভূমির উপযোগী মূলত দু'রকমের ধান বাছাই করে নিয়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষগণ। এদের একটি শ্রেণি ছিল গভীর পানির আউশ ধান আর একটি শ্রেণি ছিল গভীর পানির আমন ধান। এ দুটোই বোনা হতো মার্চ (ফাল্গুন-চৈত্র) মাসে। আউশ কাটা হতো জুলাই (আষাঢ়-শ্রাবণ) মাসে আর আমন ধান ঘরে তোলা হতো নভেম্বর-ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ) মাসে। জলা আমন ধান সাধারণত এক থেকে দেড় মিটার গভীর পানিতে চাষ করা হতো। কোথাও কোথাও চার পাঁচ মিটার পর্যন্ত গভীর পানিতেও কোন কোন জাতের আবাদ করা হতো। পানি বাড়ার বাড়ার সাথে সাথে এসব ধান লম্বা হতে পারতো। আউশ ধানের জাতগুলো দৈনিক ত্রিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারতো অন্যদিকে আমন ধান দৈনিক চল্লিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করতে পারতো।.. জমিতে পানি আসবার আগে এসব ধানের বীজ বোনে দিয়ে পানি আসার অপেক্ষায় থাকতো মানুষ। এরপর যখন পানি আসতে শুরু করতো পানির সাথে পাল্লা দিয়ে এদেরও দ্রুতো ঘটতো বৃদ্ধি। তারপর এক সময় সে ধান গাছে ফুল হতো এবং ধানের ছড়া বেড়িয়ে আসতো। এক সময় পানি কমে গেলে এসব ধান সংগ্রহ করে নিতো মানুষ। একেবারেই যত্ন ছাড়া, বাড়তি কোন খরচ ছাড়া পাওয়া যায় এই ধান। পুষ্টি সরবরাহ করার ঝামেলা খুব একটা নেই, নেই আগাছা নির্মূলের কোন সমস্যা। ..বাংলাদেশে একসময় ৮০০ জাতের গভীর পানির ধানের আবাদ হতো।



..ভারী চমৎকার মনোহরা একেকটি নাম এদেশের কোন কোন জলী ধান জাতের। চমৎকার সেসব নামের মধ্যে রয়েছে- গন্ধকস্তরী, কাঁচাহলুদ, মালভোগ, মুক্তশুর, দুধকলম, লক্ষীকাজল, জলকুমারি, মালতি, কনককামিনি, চিনিগুরি, কাজলা, লক্ষীকাজল, গৌরকাজল, বাঁশীরাজ, দেবমনি, হরিণকাজলী, মুক্তাহার, হলদেবরণ, ঘৃতকমলী, কালোজটা, মধুমালা, নোলক, রাজফল, মুক্তাহার, নিলকুমার, কনকচূড়া, ফুলবাদাম, দুধলুচি, রূপেশ্বর, রাজেশ্বর, পদ্মকমল, বাগদান ইত্যাদি .. ফুলকরি, বাসাইল, করকটি, কালমেকরি, জোয়াল ভাঙ্গা, বাদল, বাও আমন, পঙ্খীরাজ ইত্যাদি.. গোদালাকি, গোয়াই, ধলা আমন ইত্যাদি.. সোনাদিঘা, পানিডুমুরি, বকুলদিঘা, ইজলদিঘা ইত্যাদি।"[১৫]

এছাড়া শহীদুর রশীদের বই থেকে জানা যায়, ধান হলো পাহাড়ী জুম চাষের অন্যতম ফসল। প্রতি গর্তে দেওয়ার জন্য ধানকে অবলম্বন করে মেশানো হয় অন্য ফসলের বীজ। জুম চাষীরা কালো, লাল, বাদামী, সাদা চাল বিশিষ্ট অনেক রকম দুর্লভ মূল্যবান বিন্নি ও স্থানীয় ধান চাষ করেন। এছাড়া নেত্রকোনায় বসবাসকারী হাজং, গারো, রাংসা, সাংমা, মান্দা, দারিং আদিবাসীরাও নানান ধরনের বিন্নি ধান আবাদ করেন।

উপরের আলাপে আমাদের ধানসম্পদের প্রাচুর্যতার কিছু নমুনা পাওয়া গেল। সেই সাথে কৃষকদের জ্ঞান, দক্ষতা, সৃজনশীলতা, নান্দনিকতা ও রুচিবোধের মাত্রা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।





ধানগুলো সব গেল কোথায়?

এখন আমাদের দেশের কৃষকদের কাছে এই স্থানীয় জাতগুলোর খুব অল্পসংখ্যক জাতই টিকে আছে। এই জাত হারানোর কাহিনী জানতে হলে আমাদেরকে ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। সম্পদশালী ভারতীয় উপমহাদেশ বরাবরই বাইরের আক্রমণের শিকার হয়েছে। পাঠান, মুঘল, ব্রিটিশরা আমাদের দেশ দখল ও শাসন করতে চেয়েছে মূলত এখানকার প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের জন্যই। আর এখানকার মানুষ বিশেষ করে কৃষকরা বারবার বিদ্রোহ করেছেন। ড. আলি নওয়াজের "খনার বচন কৃষি ও কৃষ্টি" বই থেকে আমাদের কৃষি ঐতিহ্য ও বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়:

> "বৈদিক যুগ থেকে মুসলিম আমল পর্যন্ত শ্লোকে-ছড়ায়, প্রবাদ-প্রবচনে ও কাব্যে-মহাকাব্যে কৃষির যে মাহাত্ম্য বিধৃত, তাতে কৃষির প্রতি মানুষের মূল্যবোধ ও আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে একটি কৃষি আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খনার বচনে আছে- গরু, জরু, ধান, এ তিনে রাখে মান। ..আর্যেতর যুগ থেকে ব্রিটিশ আমলের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে কার্পাসের চাষ হতো, ঘরে ঘরে চরকায় সুতো হতো, তাঁতিরা কাপড় বুনে দেশের চাহিদা মেটাতো, বিশ্ববিখ্যাত মসলিন কাপড় ও অন্যান্য সুতি বস্ত্র সমগ্র ইউরোপে রপ্তানি হতো। ..মোগল আমলে কিষাণগণ ছিলো সুখী, তাদের কল্পনাতীত প্রাচুর্য ছিলো। ..সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসন- মুদগরের প্রচন্ড আঘাতে বাঙালির পাঁচ হাজারের কৃষি-কৃষ্টির বুনিয়াদই বিলকুল বিধ্বস্ত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায় যোগানদার হয়ে কিংবা আধভাঙা দু'চারটে ইংরেজি লবজের কেরামতিতে ইংরেজদের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে একদিকে সৃষ্ট হয় রুচিহীন অকাট মূর্খ জমিদার, অপর দিকে পাইক-পেয়াদা-কেরানির অহংকার-আঁটা এক শ্রেণির তথাকথিত ভুঁই ফোঁড় 'ভদ্র' লোক। ..কৃষককে কৃষিকাজ করতে হতো সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর অসীম প্রয়োজনে এবং তাদের রুদ্ররোষ থেকে বাঁচার জন্য। এর ফল দাঁড়ালো,

প্রাগার্য যুগ থেকে মুসলিম আমল পর্যন্ত যে কৃষিকাজ একটি সর্বত্তোম পেশা হিসেবে স্বীকৃত, ইংরেজ আমলে তাই হয়ে উঠে সবচে অবজ্ঞাত। ..ইংরেজ আমলে তাদের কৃষি ও বাণিজ্য নীতির ফলে বাংলাদেশ হতে তুলার চাষ প্রায় নির্বংশ। ..দেশী তাঁত ভেঙ্গে ফেলে, চরকা ধ্বংস করে। ফলে ইউরোপে যে ভারতীয় বস্ত্রের বাজার ছিলো, তা আপনা-আপনি গুটিয়ে যায়। নিরুপায় বস্ত্র শিল্পীরা বেকার হয়ে কৃষি কাজে যোগদান করতে বাধ্য হয়। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৮৯১ সালে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ছিল ৬১%, ১৯০৯ সালে ৬৬%, ১৯২১ সালে ৭৩% এবং ১৯৩৯ সালে দাঁড়ায় ৭৫%-এ। ..ইংরেজদের ঔপনিবেশিক নীতির ফলে শুধু যে কার্পাস চাষ আর তাঁত শিল্পই ধ্বংস হলো, তা নয়, এ দেশের কৃষক বাধ্য হলো ইংল্যান্ডের কলকারখানার জন্য কাঁচামাল প্রস্তুত করতে (নীল চাষ)। ..নীলকর সাহেবরা গ্রাম-গ্রামান্তরে কুঠি স্থাপন করে স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায়, চাবুকের নির্মম আঘাতে বাংলা ও বিহারের কৃষককূলকে নামমাত্র দামের বিনিময়ে ধানী জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করে। ..কৃষকের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে সৃষ্টি হলো নরপিশাচ মহাজন শ্রেণির। স্বয়ং জমিদারেরাও সুদের ব্যবসা শুরু করে। ..(খাজনা আদায়ের জন্য) জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসে মধ্যস্বত্বভোগী একটি অতি লোভী শোষক শ্রেণি। সব লুটপাট আর শোষণের শিকার সরাসরি কৃষক শ্রেণি। ..এর ফল দাঁড়ালো, জীবন ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বুদ্ধিমান ও স্বল্প শিক্ষিত লোকেরাও কোলকাতায় পাড়ি জমায় ক্যাশ টাকার লিপ্সায়। ..সৃষ্টি হলো নতুন দর্শন- যে হাতে লাঙ্গল ধরবে, সে হাতে কলম ওঠে না। অর্থাৎ কৃষিই শিক্ষার অন্তরায়। অথচ পূর্বের দর্শন ছিলো, যারা জ্ঞানী, তারাই শুধু কৃষি কাজ করতে পারেন। জীবনের নতুন দর্শন ও মূল্যবোধ্যের জন্য কৃষি কাজে নিযুক্ত রইলো নিরেট মূর্খ, নিরক্ষর, নির্বোধ ও অকর্মণ্য লোকেরাই।..ইংরেজ শাসনের মাঝামাঝি পর্যন্ত ধানের উৎপাদন ছিলো বিঘা প্রতি ১৬ মণ, তা আরও দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। দেশে শিক্ষার পরিমাণ যতই বাড়তে থাকে, কৃষির অবস্থা ততই করুণ হতে থাকে।"[১৬]

খাদ্য উৎপাদন এবং সুষম বন্টন অনেক আগে থেকেই হয়তো চ্যালেঞ্জিং ছিল। বিভিন্ন ধর্মে দরিদ্র মানুষের খাবারের যোগান কিছুটা সুনিশ্চিত করতে অন্নদানকে মহান দান ও অতিথি সেবাকে পুণ্যকর্ম বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তবে বাংলার অধিকাংশ ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় সব মানুষ সচ্ছল ছিল, ব্রিটিশ শাসনের আগে এ দেশে দারিদ্র্য ছিল না, যদিও এ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মতভেদ আছে।[১৭] তবে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা এ দেশ থেকে প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করে, এ দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য কুক্ষিগত করে, পরবর্তীতে এখানে খাজনা আদায় অনেক বেড়ে যায় এবং এ দেশের খাজনা এ দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় না করে এ অর্থ চলে যেত ইংল্যান্ডে।[১৮]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, অর্থাৎ ১৯৫০ এর দশকের শেষ ভাগে ভারতীয় উপমহাদেশসহ অন্যান্য উপনিবেশভুক্ত দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করা শুরু করে। তবে এসব সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোকে 'অনুন্নত' অ্যাখ্যা দিয়ে পশ্চিমা দেশগুলো (বিশেষত আমেরিকা এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ) এসব দেশের 'উন্নয়নের' দায়িত্ব নেয়। স্থানীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, উৎপাদন পদ্ধতি, প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করে বিশ্বব্যাপী একই রকম 'উন্নয়ন' কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীতে ঐসব 'উন্নত' দেশের পরামর্শ মোতাবেক 'অনুন্নত' দেশগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে 'পশ্চিমা জীবনাধারা' বা 'আমেরিকান লাইফস্টাইল' অর্জনে মনোযোগী হয়। শিল্প বিপ্লবকে পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিমা দেশগুলো প্রয়োজনীয় পুঁজি, প্রযুক্তি, কাঁচামাল ও বিশেষজ্ঞ সরবরাহ শুরু করে।

এই উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ১৯৬০ এর দশকে বিশ্বব্যাংক 'অনুন্নত' দেশগুলোতে সেচ প্রকল্প ও ফসল-বিজ্ঞান গবেষণায় সহায়তা ও ঋণ প্রদান শুরু করে। এসময় কৃষি-উন্নয়ন প্যাকেজের অংশ হিসেবে, হাই-ইনপুট রেসপনসিভ (অর্থাৎ চাষের জন্য কৃত্রিম রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক প্রয়োজন) বা উচ্চফলনশীল জাতের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও সেচযন্ত্র কৃষকের কাছে বিক্রি করা শুরু হয়। এর মাধ্যমে উত্তরের দেশগুলো থেকে পুঁজি, দক্ষতা ও প্রযুক্তি দক্ষিণের দেশগুলোর কৃষি সেক্টরে আসা শুরু হয় এবং বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি ব্যবসা শুরু করে। এসব অধিকাংশ আধুনিক বীজ উৎপাদনকারী কোম্পানিই আবার রাসায়নিক উপকরণ (সার, বালাইনাশক) উৎপাদনের সাথে জড়িত। কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির এই ঘটনাকে 'সবুজ বিপ্লব' বলা হয়। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সবুজ বিপ্লবকে বৈদেশিক নীতির অন্যতম উপাদান হিসেবে যুক্ত করে। এভাবে আমাদের কৃষকরা বীজ, সার, কীটনাশক বিষ, বালাইনাশক, সেচযন্ত্র উৎপাদনকারী বহুজাতিক কোম্পানির সাথে যুক্ত হয়ে যায়। কৃষকের জন্য কৃষি লাভজনক থাকুক বা না থাকুক, এই কোম্পানিগুলো ঠিকই মোটা অংকের আয় করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে কৃষি ব্যবস্থার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে। বর্তমানে সরাসরি উপনিবেশিক শাসনের আওতাভুক্ত না থাকলেও, আমাদের কৃষি ব্যবস্থা কি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি, নাকি উপকরণ ও প্রযুক্তির জন্য অন্যদের মুখাপেক্ষি হয়ে আছি, তা ভাবা প্রয়োজন। তিনশ বছর শোষণের পর সমস্ত সম্পদ লুট করে যখন আমাদের 'অনুন্নত' বলা হলো, তখন তাদের উদ্দেশ্য কি আমাদের 'উন্নয়ন' ছিল, নাকি তা নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা পাকাপাকি করার কৌশল ছিল, তা নিয়েও চিন্তা করা প্রয়োজন।

ধান গবেষণার জন্য ১৯৬০ সালে ফোর্ড ফাউন্ডেশন, রকফেলার ফাউন্ডেশন এবং ফিলিপাইন সরকারের সহায়তায় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর সদর দপ্তর ফিলিপাইনের লস ব্যানোস শহরে এবং এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের ১৭টি ধান উৎপাদনকারী দেশে এর অফিস রয়েছে। ইরি-র কাজের মূল লক্ষ্য হচ্ছে: ধান গবেষণার মাধ্যমে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা হ্রাস; ধান চাষী ও ভোক্তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সার্বিক কল্যাণ সাধন; এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ধান ক্ষেত ও আশেপাশের পরিবেশের সুরক্ষা। ইরি-র কাজে যারা অর্থ প্রদান করেন তাদের বিনিয়োগকারী (investors) বলা হয়। বর্তমানে বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস্ ফাউন্ডেশন ইরি-র অন্যতম বিনিয়োগকারী। এছাড়া ইন্ডিয়া, ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, জাপান, যুক্তরাজ্য, চীন, সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক), কৃষি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান (সিনজেনটা, বেয়ার), জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিজিআইএআর (CGIAR: Consortium of International Agricultural Research Centres) মূলত ইরি-র বিনিয়োগকারী।

তবেসরকারিভাবে এখানে ধানের জাত উন্নয়নে কাজ শুরু হয়েছিল ১৯১১ সালে। চাষীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের জাত সংগ্রহ করা হয় এবং ভালো জাত নির্বাচনের লক্ষ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা ফার্মে সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৪০ সাল নাগাদ ১০টি জাত অনুমোদন দেওয়া হয়: কটকতারা, সূর্যমুখী, চারনক, পুখি, আতলাই, পানবিরা, ধারিয়াল, কুমারি, পাশপাই ও মরিচবটি। ১৯৫০ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ইন্ডিকা ও জ্যাপোনিকা জাতের সঙ্করায়নের একটি প্রকল্প গ্রহণ করে এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ইন্ডিয়ার কটকে কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা কেন্দ্রে কয়েকটি ধানের জাত পাঠানো হয়।

ইরি-র প্রথম আন্তর্জাতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় বাংলাদেশে। ১৯৬৫ সালে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ইরি সাভারের ডেইরী ফার্মে ৩০৩টি জাতের ধান পরীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জন্ম প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও প্রথম উচ্চফলনশীল ধান জাত আই-আর-আট (IR8) বিতরণ করা হয়। আর বাংলাদেশ থেকে ৭,১৩৩টি জাতের ধানের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে ইরি-র জিনব্যাংকে গচ্ছিত রাখা হয়। সত্তরের দশকে মূলত ইউএসএইড (United States Agency for International Development), এডিবি (Asian Development Bank), আইডিআরসি (International Development Research Centre of Canada) ও রকফেলার ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ইরি বাংলাদেশের ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কর্মসূচিতে সহযোগিতা করেছিল।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ধানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ১৯৭০ সালে গাজীপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্ট পাকিস্তান রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (EPRRI) প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং স্বাধীনতার পর এই প্রতিষ্ঠানের নাম পাল্টে বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ব্রি) করা হয়।[১৯] প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্রি-র গবেষকরা ধানের ফলন বাড়ানোর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য ধানের উচ্চফলনশীল বিভিন্ন জাত এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন শুরু করেন। এজন্য তারা আই-আর-আট এর মত স্থানীয় কৃষি-প্রতিবেশ উপযোগী হাই ইনপুট রেসপনসিভ উচ্চফলনশীল জাত উন্নয়নে মনোযোগী হন। ১৯৭০ সালে ব্রি-র প্রথম জাত বোরো ও আউশ মৌসুমে আবাদযোগ্য বিআর১ বা চান্দিনা উদ্ভাবন করা হয়েছিল আইআর২৬২-২৪-৩ এবং টিকেএম৬ দুটি বিদেশী জাতের মধ্যে সঙ্করায়ন করে। ১৯৭১ সালে একই মৌসুমের জন্য সিপি-এসএলও এবং সিগাডিস নামের দুটি বিদেশী ধানের মধ্যে সঙ্করায়ন করে বিআর২ বা মালা উদ্ভাবন করা হয়। পরবর্তিতে ১৯৭৩ এ বিদেশী ধান আইআর৫০৬-১৩৩-১ এবং স্থানীয় জাত লতিশাইলের মধ্যে সঙ্করায়ন করে বিআর৩ বা বিপ্লব উদ্ভাবন করা হয়, যেটি ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক ফলন প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। আইআর২০ এবং আইআর১১৪-৩-১ এর মধ্যে সঙ্করায়ন করে ১৯৭৫ সালে উদ্ভাবিত আলোক-সংবেদনশীল জাত বিআর৪ বা ব্রিশাইল-ও ১৯৭৬ সালের আন্তর্জাতিক ফলন প্রতিযোগীতায় প্রথম হয়। এভাবে ২০১৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত পর্যন্ত ব্রি-র গবেষকরা ধানের ৯৫টি উচ্চ ফলনশীল জাত ও কয়েকটি হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করেছেন (Bangladesh Rice Knowledge Bank)। এছাড়া বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ধানের জাত উন্নয়নে কাজ করছে এবং ২১টি জাত উদ্ভাবন করেছে। তবে এই জাতগুলো থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে হলে কৃত্রিম রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বিষ প্রয়োগ করতে হয়।

ধান বা যে কোন গাছ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য ও শক্তি তৈরি করে। এই খাদ্য ও শক্তির এক ভাগ ব্যয় হয় শারীরিক বৃদ্ধির (কান্ড, পাতা, মূল) জন্য, আর অন্য ভাগ ব্যয় হয় বংশধারা বজায় রাখতে বীজ তৈরির জন্য। আধুনিক প্রজননবিজ্ঞানে বীজ তৈরির জন্য খাদ্য ও শক্তির ভাগকে অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে আধুনিক উচ্চফলনশীল জাতে গাছ খাটো হয় ও বীজের পরিমাণ বা ফলন বেশি হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিতেই এখন ব্রি উদ্ভাবিত কয়েকটি উচ্চফলনশীল জাত (মূলত বিআর ১০, বিআর ১১, ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ২৯, ব্রি ধান ৪৯ এবং অন্যান্য), ইন্ডিয়া থেকে আসা স্বর্না, জিরাশাইল এবং বিভিন্ন কোম্পানির নানান হাইব্রিড

ধান চাষ হচ্ছে। কিছু এলাকার কৃষক এখনও চিনিগুড়া, কালোজিরা, বাঁশফুল, নাজিরশাইল, কাটারিভোগ, গাঞ্জিয়া, টোপাবোরো, মোটাবোরো, বিন্নি ইত্যাদি স্থানীয় জাত চাষ করছেন।

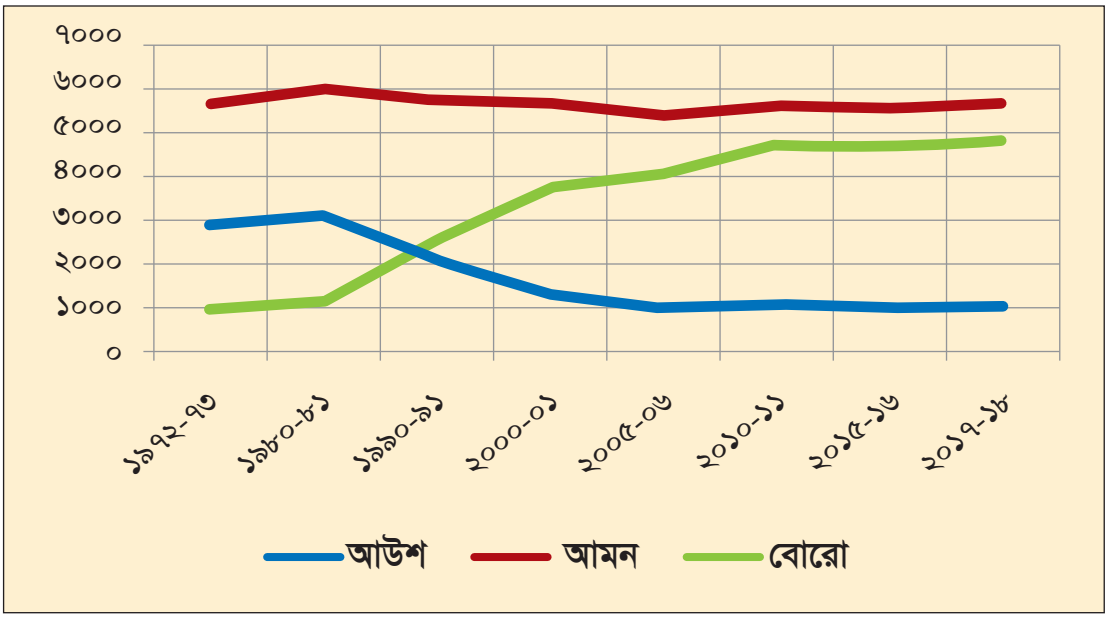
যাই হোক এভাবেই, দেবল দেবের ভাষায় "মূলত ইরি উদ্ভাবিত উচ্চ-ফলনশীল আই-আর-আট ও তাইচুং ধানের বীজ দিয়ে শুরু হয়ে সবুজ বিপ্লবের ঢেউ মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যেই হাজার হাজার জাতের ধান একেবারে মুছে দিয়েছে, অযুত বছরের সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা করতে পারে নি।.. ত্রিশ বছরের মধ্যে তিলে-তিলে গড়ে ওঠা সুপ্রাচীন সম্পদের এই বিপুল বৈচিত্র্য হারিয়ে গেল।"[২০]

বাংলাদেশে ধানের মৌসুম ৩টি: আউশ, আমন ও বোরো। আউশ ধান সাধারণত উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে বীজধান সরাসরি মাঠে বুনে আবাদ করা হয়, নয়তো চারা রোপণ করা হয়। আর আমন মৌসুমে অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি যেখানে বর্ষার পানি বেশি উঠতো না সেখানে রোপা আমন এবং সাধারণত নীচু জমিতে বোনা আমন আবাদ করা হতো। সাধারণত যে সব জমিতে প্রায় সারা বছর পানি জমে থাকে এবং রবি মৌসুমে অন্য কোন ফসল আবাদ করা যায় না, সে রকম জমিতে বোরো ধানের চাষ করা হতো। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও এদেশে ধান উৎপাদন হত প্রধানত আউশ ও আমন মৌসুমে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বোরো মৌসুমে ধান আবাদের প্রচলন বাড়তে থাকে। ২০১৭-১৮ সালে ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায় আউশ ও আমন মৌসুমের ধানের জমির পরিমাণ কমে গেলেও বোরো ধানের জমি প্রায় ৫ গুণ বেড়েছে (সারণি ও গ্রাফ ১)।

মৌসুমভিত্তিক ধান চাষের জমির পরিমাণ

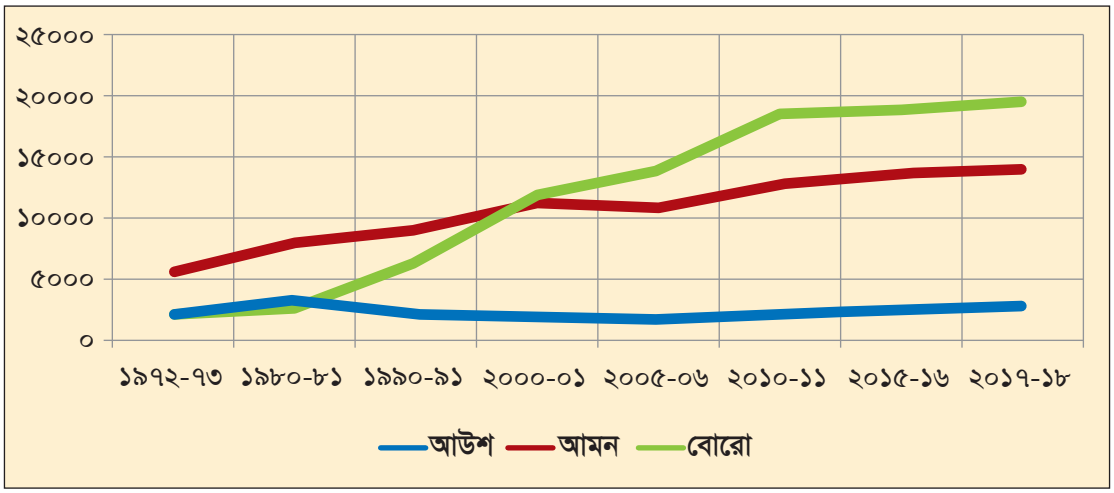
(হাজার হেক্টর)

বছর	আউশ	আমন	বোরো
১৯৭২-৭৩	২৯৩০	৫৭১৩	১০০২
১৯৮০-৮১	৩১১১	৬০৩৬	১১৬০
১৯৯০-৯১	২১০৭	৫৭৭৫	২৫৪৮
২০০০-০১	১৩২৫	৫৭১০	৩৭৬২
২০০৫-০৬	১০৩৪	৫৪২৯	৪০৬৬
২০১০-১১	১১১৩	৫৬৪৬	৪৭৭০
২০১৫-১৬	১০২৫	৫৫৯০	৪৬৮৫
২০১৭-১৮	১০৭৫	৫৬৮০	৪৮৫৯



সারণি ১ ও গ্রাফ ১: মৌসুম অনুযায়ী ধান চাষের জমির পরিমাণ
(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট[২১])

বোরো ধানের জমি বাড়ার সাথে সাথে, আউশ ও আমন মৌসুমের তুলনায় বোরো ধানের উৎপাদনও বেড়েছে। ১৯৮০ পর্যন্ত বাৎসরিক ধানের প্রায় ৮০ ভাগ উৎপাদন হত আউশ ও আমন মৌসুমে। এরপর বোরো ধানের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং ২০০০ সাল নাগাদ বোরো মৌসুম থেকেই মোট ধানের প্রায় অর্ধেক আসা শুরু হয় (গ্রাফ ২ ও সারণি ২)। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ধানের ৫৪% বোরো, ৩৯% আমন এবং ৭% আউশ মৌসুমে উৎপাদিত হয়েছিল। সত্তরের দশকে আউশ মৌসুমে ২৩ ভাগ ধান উৎপাদন হলেও, ক্রমে কমে তা ৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে এবং আমনের হিস্যা ৫৬ ভাগ থেকে ৩৯ ভাগে নেমে এসেছে।



বছর	মৌসুমভিত্তিক ধান উৎপাদনের পরিমাণ (হাজার টন)			মোট	বছরের মোট উৎপাদনের মৌসুমভিত্তিক হার (হাজার টন)		
	আউশ	আমন	বোরো		আউশ	আমন	বোরো
১৯৭২-৭৩	২২৪৩	৫৫৮৭	২০৭১	৯৯০১	২৩%	৫৬%	২৩%
১৯৮০-৮১	৩২৮৯	৭৯৬৪	২৬৩০	১৩৮৮৩	২৪%	৫৭%	১৯%
১৯৯০-৯১	২২৬১	৯১৬৭	৬৩৫৭	১৭৭৮৫	১৩%	৫২%	৩৬%
২০০০-০১	১৯১৬	১১২৪৯	১১৯২০	২৫০৮৫	৮%	৪৫%	৪৮%
২০০৫-০৬	১৭৪৫	১০৮১০	১৩৯৭৫	২৬৫৩০	৭%	৪১%	৫৩%
২০১০-১১	২১৩২	১২৭৯১	১৮৬১৬	৩৩৫৩৯	৬%	৩৮%	৫৬%
২০১৫-১৬	২৪৬৮	১৩৫৯১	১৯০০১	৩৫০৬০	৭%	৩৯%	৫১%
২০১৭-১৮	২৭০৯	১৩৯৯৩	১৯৫৭৫	৩৬২৭৭	৭%	৩৯%	৫৪%

গ্রাফ ২ ও সারণি ২: মৌসুম অনুযায়ী ধানের উৎপাদনের পরিমাণ
(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট[২২])

১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায় ২০১৭-১৮ সালে ধান চাষের জমি প্রায় ২০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বাৎসরিক ফলনের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৩.৬ গুণ। সত্তরের দশকে আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ০.৯১, ১.১৭ ও ১.৯৭ টন, যা ২০১০ সাল পরবর্তী সময়ে বেড়ে হয়েছে গড়ে যথাক্রমে ২.২৭, ২.৩৭ ও ৩.৯৮ টন। তবে এত উৎপাদন বৃদ্ধির পরও বাংলাদেশ বিদেশ থেকে চাল আমদানী করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিদেশ থেকে ১৭৪.৬ কোটি মার্কিন ডলারের চাল আমদানি করা হয়েছিল (সারণি ৩)। নিচের সারণিতে ২০০৬-০৭ সাল থেকে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত চাল আমদানি বাবদ খরচের হিসাব দেখা যাচ্ছে:

বছর	আমদানির পরিমাণ (কোটি মার্কিন ডলার)	বছর	আমদানির পরিমাণ (কোটি মার্কিন ডলার)	বছর	আমদানির পরিমাণ (কোটি মার্কিন ডলার)
২০০৬-০৭	১৮	২০১০-১১	৮৩	২০১৪-১৫	৫৫.৫
২০০৭-০৮	৮৭.৪	২০১১-১২	২৮.৮	২০১৫-১৬	১১.৯
২০০৮-০৯	২৩.৯	২০১২-১৩	৩	২০১৬-১৭	৭.৬
২০০৯-১০	৭৫	২০১৩-১৪	৩৪.৭	২০১৭-১৮	১৭৪.৬

সারণি ৩: ধান আমদানির পরিমাণ
(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ[২৩])



দেবল দেবের মতে কৃষকের ক্ষেতে ধানের জাতের পরিবর্তনের নেপথ্য কারণ ও ফলাফল:

> "১৯৬৫ সাল থেকেই আন্তর্জাতিক কৃষিব্যবসায়ীদের আগ্রাসী বিজ্ঞাপন, প্রযুক্তিনির্ভর কৃষিতে ঢালাও সরকারি অনুদান, আর উচ্চফলনশীল 'ম্যাজিক' বীজের বাজার দখলের ফলে বেশিরভাগ দেশী, পুরনো জাতের ধান হারিয়ে গেছে, আজও যাচ্ছে। কেউ জানে না ঠিক কতগুলো জাতের সনাতন ধান আজ সারা দেশে চাষ হচ্ছে। "বিজ্ঞানের অগ্রগতি", "ক্ষুধার কবল থেকে মানবজাতির মুক্তি", "আধুনিক কৃষির জয়যাত্রা"- ইত্যাকার শ্লোগানের বাগাড়ম্বর যখন সরকারিভাবে সরকারি যন্ত্রে প্রচার হতে থাকে, সেসব দিবারাত্র শোনবার পর কে আর সেকেলে "অবৈজ্ঞানিক" চাষের পরম্পরাকে আকড়ে রাখতে চাইবে?
>
> .. অনেকগুলো দেশী জাতের ধান যে উপযুক্ত সার পেলে অতি উচ্চ ফলন দিতে পারে, সে তথ্য ড. রিচারিয়া অনেক আগেই জানিয়েছিলেন। দেশী জাতের অনেক ধান রোগ-পোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে কোনও ওষুধপত্তর ছাড়াই। এই তথ্যটিকে ভুলিয়ে দিয়ে "ধান চাষ করলেই বিষ দিতে হবে" এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে বিষ বিক্রেতার বিজ্ঞাপন। আর বিষের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে প্রতি বছরই নতুন নতুন রোগ আর শত্রুপোকা বিষ-প্রতিরোধী হয়ে উঠছে, তাদের দমন করতে বাজারে আসছে আরও নতুন, আরো কড়া বিষ। চাষীকে শেখানো হয়েছে পোকা মানেই শত্রু, তাদের মারতে হবে।"[২৪]

আমাদের পূর্বপুরুষ কৃষকরা ধানের নানান ধরনের জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি পরম্পরাগতভাবে সেইসব ধান চাষ ও সংরক্ষণ করেছিলেন। সেই সাথে বিকশিত হয়েছে চাষ পদ্ধতি, শস্য বিন্যাস এবং ধানের নানান ব্যবহার। বিশেষ করে নারীরা নানান ফসলের স্থানীয় জাতের সুরক্ষা ও পুনরুৎপাদনে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ড. আলি নওয়াজের "খনার বচন কৃষি ও কৃষ্টি" বইতে ধান চাষ বিষয়ে ৮৯-এর অধিক বচন আছে। ধান হারিয়ে গেলে সেইসব পরীক্ষিত ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান কি আর টিকে থাকে? দেবল দেবের বয়ানে:

"সাবেকী ধানের বৈচিত্র্যের প্রায় সবই তো হারিয়ে গেছে। তার সঙ্গে লুপ্ত হয়েছে সেসব ধানের চাষ সম্পর্কে বিশিষ্ট জ্ঞান। কোন জাতের জমিতে কোন জাতের ধান বেশি ফলন দেবে, বৃষ্টি দেরিতে হলে কোন জাতের ধানের ফলন কমবে না, কোন কোন শস্য ধানের সঙ্গে চাষ করলে রোগ-পোকার উপদ্রব কমবে, ধানের আগে কি বুনলে জমির উর্বরতার পুনরুদ্ধার হবে, কেমনভাবে শুকোলে চালে পোকা ধরবে না, এমনকি কোন জাতের ধান মুড়ির জন্য ভালো কিন্তু ভাতের জন্য ভালো নয়, কোন জাতের ধানে এমন পুষ্টিগুণ আছে যে রুগীকে খাওয়ালে স্বাস্থ্য ফিরে পাবে- এমন তথ্যভান্ডার প্রায় শূন্য।

.. ধানের সঙ্গে সঙ্গে, অথবা ধানচাষের আগে-পরে যে সব ফসল চাষ হত, কিংবা ধানক্ষেতের চারিদিকে যে বিভিন্ন বুনো গাছপালা থাকত, ঐসব পোকার আক্রমণ তাদের উপর দিয়েই যেত। হরেক রকম খাদ্যবস্তু থাকার ফলে, ধানের ওপর এদের নজরই পড়ত না। সবুজ বিপ্লবের পর সারাবছর ধরে কেবল ধান আর ধান চাষের যে-অভ্যাস গড়ে উঠল, আর তার সঙ্গে যে-হারে বৃক্ষনিধন হতে লাগল, তাতে ঐসব পোকারা ধানের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল, বিকল্প খাদ্যের অভাবে। সুতরাং রাসায়নিক বিষ প্রয়োগ করতে হয়।"[২৫]

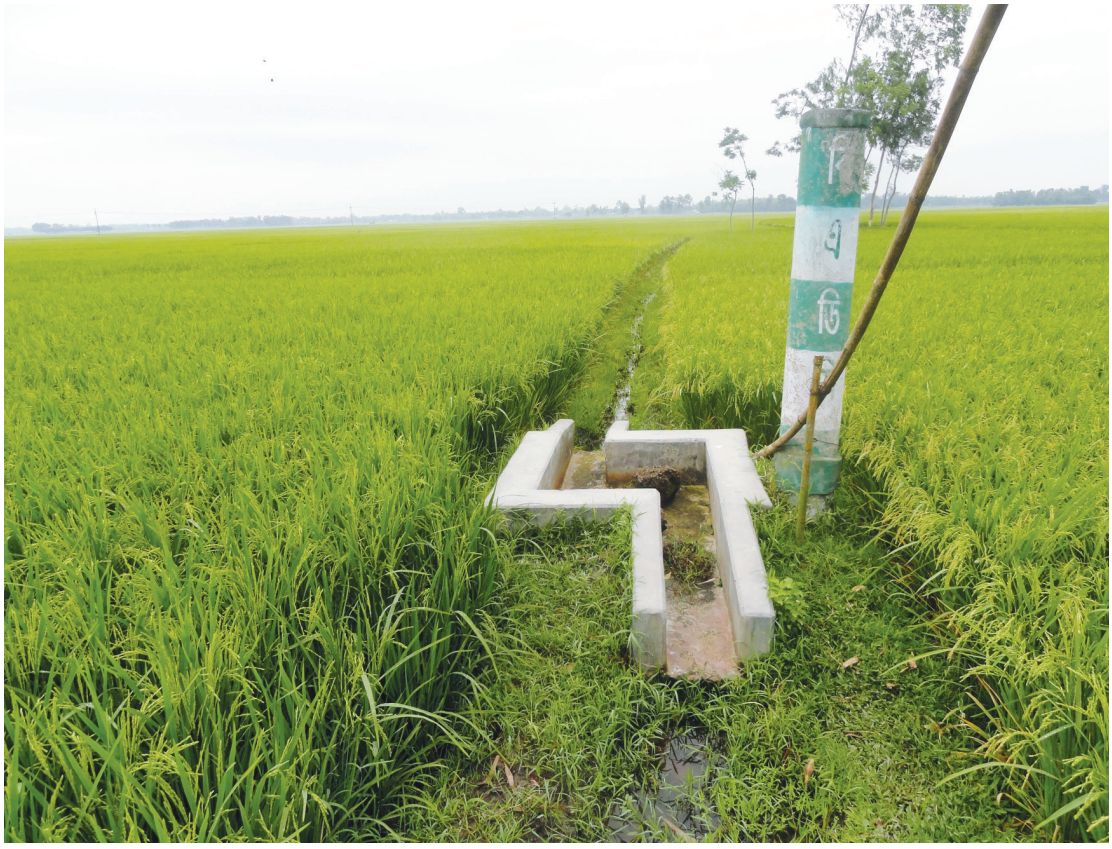
অর্থনীতিবিদ আব্দুল বায়েস ও মাহবুব হোসেনের মতে গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মূল হাতিয়ার ছিল উচ্চফলনশীল বোরো ধান, যাকে তাঁরা "মহানায়ক" হিসেবে অভিহিত করেছেন। "তিন বিঘা জমি" বইতে তাঁদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে:

"এই প্রবৃদ্ধির (উৎপাদন বৃদ্ধি) বেশিরভাগ ঘটেছে নব্বই-র দশকের প্রথম দিকে এবং প্রবৃদ্ধি প্রসারণ ঘটেছে মূলত উন্নত জাতের ধান চাষে ও প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষককে সহায়তা করার জন্য ক্ষুদ্র সেচের দ্রুত বিস্তৃতির কারণে। .. আসলে সেচ প্রযুক্তির আবির্ভাবের ফলে যা ঘটেছে তা হলো চাষি শুষ্ক মৌসুমের সনাতন কম উৎপাদনশীল ধান আউশ ও বোনা আমন থেকে সরে এসে অধিকতর উৎপাদনশীল আধুনিক ধান চাষে (বোরো) জমি বরাদ্দ দিতে থাকে। .. ১৯৮৯ সাল থেকে ডিজেল ইঞ্জিনের আমদানি উদারিকরণ, আমদানি শুল্ক হ্রাস এবং সেচযন্ত্রের ক্ষেত্রে আরোপিত নির্ধারিত মান বা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের বিধি নিষেধ উঠে যাওয়া ইত্যাদির ফলে সেচাধীন জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে ক্ষুদ্র সেচযন্ত্রের মাধ্যমে (যেমন অগভীর নলকূপ) দেয়া পানির ইউনিট প্রতি খরচ হ্রাস পেতে থাকে। .. সেচ বিস্তারের সাথে সাথে রাসায়নিক সারের ব্যবহারও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। .. এমনকি আশির দশকে ভরতুকিমুক্ত অবস্থায় সারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার পরও সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে।"[২৬]

তাঁদের মতে, "আধুনিক প্রযুক্তি আসার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যক্তি খাতের প্রভাব এবং সরকারি নীতিমালার যুগান্তকারী পরিবর্তন যে একটা জীবননির্বাহ কৃষিকে বাজারমুখী কৃষিতে রূপান্তর

ঘটাতে পেরেছে সেটা কম কথা নয়।"[২৭] তবে তাঁরাই আবার বলছেন:

> "খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে অপুষ্টির অকল্পনীয় মাত্রা যেন বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার আকাশে কালো মেঘের মতো এক ধরনের প্রহেলিকা প্রদর্শন করে চলেছে। .. বর্তমানে বাংলাদেশে কম ওজনের শিশুদের অনুপাত (২,৫০০ গ্রামের নিচে) পৃথিবীর সর্বোচ্চ। .. সময়ের বিবর্তনে বোরো আবাদের কারণে ক্ষতিকারক এগ্রোকেমিক্যালের ব্যবহার বেড়েছে। .. আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত দেশের প্রায় ১৩ শতাংশ মানুষ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধের অত্যাধিক ব্যবহার শুধু রোগ-বালাই বাড়াচ্ছে না, বস্তুত খাদ্যের মধ্যে বিষ সংক্রমণ করে জনগণের স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে অবদান রাখছে।"[২৮]



আর এই উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কৃষকরা কতটুকু লাভবান হলো তার চিত্র পাওয়া যায় তাঁদের নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ থেকে:

> "১৯৮৮-২০১০ এই দীর্ঘ সময়কালে চালের উৎপাদনমাত্রা প্রতি হেক্টরে গড়পড়তা ২.২৬ টন থেকে ৪.২৮ টন বৃদ্ধি পায় বটে (বার্ষিক বৃদ্ধি ৩.৮ শতাংশ) কিন্তু বাজারে চালের বাণিজ্য শর্তকে প্রতিকূলে



ধানক্ষেতের আমবাগানে রূপান্তর

ঠেলে দেয়। যেমন: ধানের দাম টন প্রতি ১৬১ ডলার থেকে ১২১ ডলারে নেমে যায় যখন একই সময়ে সেচের পানি, ফসফেট ও পটাশ সারের দাম ও মজুরির হার ধানের দামের চেয়ে দ্রুত বেগে বৃদ্ধি পায়। বুঝতে কষ্ট হয় না যে এর ফলে সনাতন চাল উৎপাদন থেকে খামারের আয় ১৭২ থেকে ১৬৫ ডলার (৭ ডলার) এবং আধুনিক চালের ক্ষেত্রে ৩৫১ থেকে ২৯৩ ডলার (৫৮ ডলার) হ্রাস পায়।"[২৯]

তাই, "ধনীরা আজকাল কৃষি ছেড়েই দিয়েছে, এবং তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে গ্রামের গরীব গোষ্ঠী।"[৩০] আর ধানচাষে কৃষকের অনাগ্রহের কারণে, "এক দিকে মাছ চাষে নিম্নভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে অন্যদিকে অনুপস্থিত ভূমি মালিকরা বাগান সৃষ্টির জন্য উঁচু জমিগুলো ছেড়ে দিচ্ছে যেখানে আগে ধানের চাষ হতো।"[৩১] সব মিলিয়ে তাঁদের মতে পরিস্থিতি হচ্ছে, "চাষাবাদে কৃষকের লোকসানকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিৎ বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ থাকলেও দুর্ভাগ্যবশত রাজনীতিবিদদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থাকে ঠিক তার উল্টো- ক্ষমতায় গেলে ভোক্তাদের জন্য চালের দাম কম রাখার গালভরা প্রতিশ্রুতি। .. একদিকে সঠিক উৎপাদন তথা বাজার উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে ফসলের উঁচু দাম দিয়ে কৃষকদের উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখার তাগিদ, অন্য দিকে ক্ষমতায় যাওয়া বা থাকার জন্যে চালের কম দাম রাখার দাবি।"[৩২] আর শেষমেষ, "..অনেকটা অজান্তে সবুজ বিপ্লবের আকাশেও কালো মেঘ জমতে থাকে। আর সেজন্যই সরকার সম্প্রতি বোরো চাষে কম গুরুত্ব দিয়ে আমন ও আউশ চাষে

উদ্বুদ্ধকরণে ব্রতী হয়েছে ।"[৩৩] কৃষক ফসল তোলার সময় ধানের দাম কম থাকা, চালকল মালিকদের গুদামে ধান যাওয়ার পর ধানের দাম বেড়ে যাওয়া বা চাল ব্যবসায়ীদের নানান কারসাজি এখন স্বাভাবিক ঘটনা । যাই হোক, সবুজ বিপ্লবের চল্লিশ বছর পর তাঁদের সুপারিশ হচ্ছে:

> "আমাদের বিশ্বাস যে তার জন্য শুধু ব্যক্তিখাতের ওপর বাজার ছেড়ে দিলে চলবে না, টেকসই কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত কিছু ক্ষেত্রে সরকারের সরাসরি ভূমিকার প্রয়োজন এখনও আছে । .. টেকসই উন্নয়নের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা কমাতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে সেচ কাঠামোর বিস্তৃতির রাশ টেনে রাখতে হবে । .. কৃষিকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে দেখতে হলে কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও পরিবেশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলার কাজটি অত্যন্ত জরুরি ।"[৩৪]

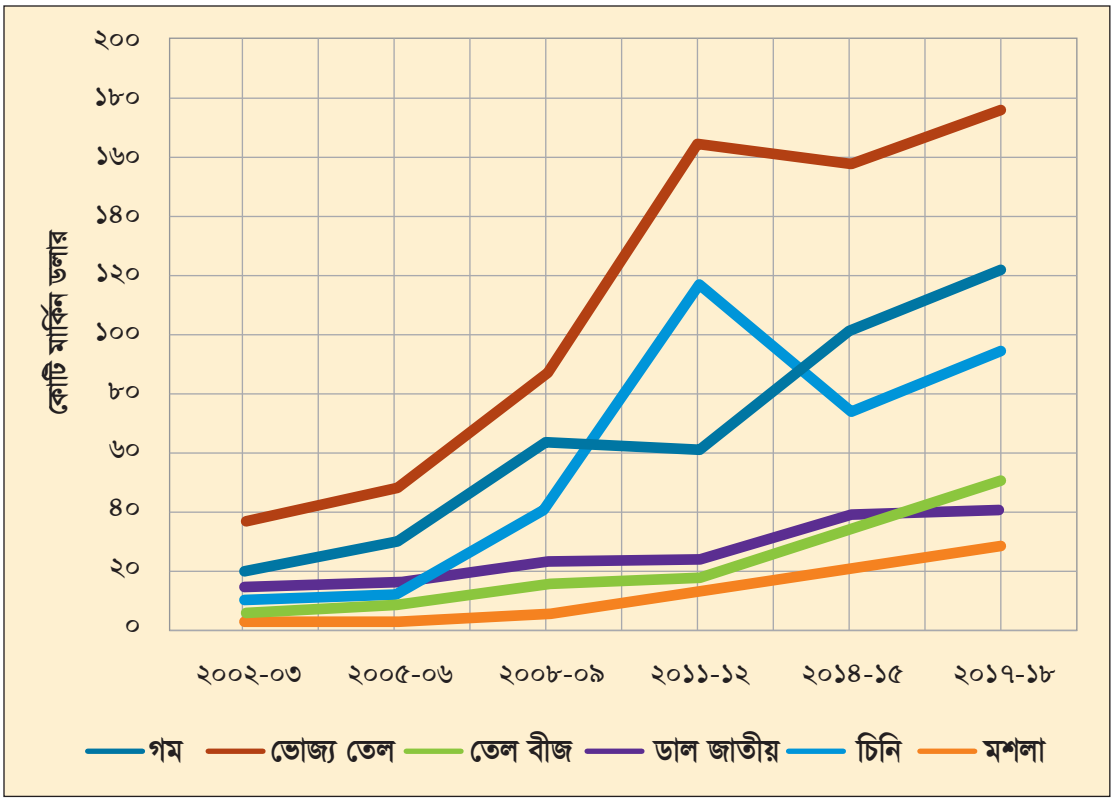
তবে কৃত্রিম রাসায়নিক সার ও বিষ প্রয়োগ করে পরিবেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা বা টেকসই কৃষি উন্নয়ন আদৌ সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখাও জরুরি । অন্যদিকে দেবল দেব রাসায়নিক নির্ভর চাষাবাদের কিছু অন্তর্নিহিত বিষয় তুলে ধরেছেন, যে হিসাবগুলো সাধারণত চট করে মাথায় আসে না, তাঁর ভাষায়:

- "প্রতি দু-তিন বছর অন্তর বা কখনও প্রতি বছরই যে নতুন বীজধান চাষীকে কিনতে হয়, সেই পৌন:পুনিক খরচটা গ্রাহ্য করা হয় না ।
- সারের পরিমাণ যথাযোগ্য দিলেও, বছর বছর যে HYV বা উচ্চফলনশীল ধানের উৎপাদন ক্রমেই কমতে থাকে । আবার ফি-বছর সমপরিমাণ ফসল পেতে গেলে যে সারের পরিমাণ বছর বছর বাড়িয়ে যেতে হয়, তার খরচটা ধরা হয় না ।
- পোকামারা বিষের খরচটাও যে ক্রমেই বাড়তে থাকে, সেটাও হিসেবে আনা হয় না ।
- উচ্চফলনশীল ধানের খড় থেকে যে লোকসান হয় সেটা ধরা হয় না । যদিও চাষীরা জানেন যে দেশী জাতের ধানের খড় দিয়ে ঘর ছাইলে চার-পাঁচ বছর স্বচ্ছন্দে চলে যায়, উচ্চফলনশীল ধানের খড় আকারে খাটো এবং দ্রুত পচে যায় বলে খড় ছাওয়ার কাজে একেবারে অনুপযুক্ত ।
- অবিরাম জলসেচ দিয়ে HYV ধানের চাষ হওয়ার ফলে বছরে দু-বার এমনকি তিনবারও ধান ফলছে একই জমিতে । এদিকে বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ অন্যান্য যেসব ফসল ঐ জমিতে আগে চাষ হত, তা আর হয় না । সর্ষে, তিল, তিসি, ছোলা, মুগ, মুসুর, কলাই, বরবটি, হিঞ্চে, পালং, নটে, বেগুন, শিম ও আরো বিচিত্র ফসলের উৎপাদন, সবুজ বিপ্লবের হিসেবে, জমির উৎপাদনশীলতার আওতায় পড়ে না । "বৈজ্ঞানিক" চাষের ফলে এসব "অনুৎপাদী" ফসলের চাষ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চাষীর দৈনন্দিন বাজার খরচ যে বেড়ে গেল, এবং ক্রমশ বেড়েই চলেছে, সেটা সবুজ-বিপ্লবী অর্থশাস্ত্রে ধরা হয় না ।
- এত টাকা জমিতে ঢাললাম, আর এত টাকার ধান উঠল- সরলরৈখিক এই অর্থশাস্ত্রীয় নিয়মে খড়ের লোকসান, আনাজপাতির খরচ বেড়ে যাওয়া, মাটির গঠন বদলে যাওয়া, ভূগর্ভের জলের স্তর নেমে

যাওয়া, বিষাক্ত ফসল ও জল খাওয়ার ফলে অগোচর স্বাস্থ্যহানি, জীববৈচিত্র্যের ঢালাও বিনাশ, জমির উৎপাদনশীলতা ক্রমশ কমতে থাকা- এসবের কোনোটাই হিসেবে আসে না। আনা হয় না। কারণ আনলেই তো সবুজ বিপ্লবের কঙ্কালসার চেহারাটা চাষীরা দেখে ফেলবে।"[৩৫]

ধানের বৈচিত্র্য কমে যাওয়ার ফলে প্রকৃতির একটু অদল বদল হলেই ধানের ফলনে বিশাল ধাক্কা লাগছে। এছাড়া বাংলাদেশে ধান চাষের জমি ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রভাব যে অন্যান্য ফসলের উপর পড়েছে তা বোঝা যায় বিদেশ থেকে গম, ভোজ্য তেল, তেল বীজ, ডাল, চিনি ও মশলার আমদানি চিত্র দেখলে (সারণি ৪ ও গ্রাফ ৩)। এসব নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-ফসলের আমদানি খরচ ও বিদেশ-নির্ভরতা প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। ২০০২-০৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ সালে গম আমদানির পরিমাণ খরচের হিসাবে ৬ গুণ বেড়েছে। এছাড়া এই সময়ে ভোজ্য তেলের আমদানি ব্যয় ৩৬.৪ থেকে ১৭৬.১, তেল বীজ ৬.৪ থেকে ৫০.৯, ডাল ১৪.৫ থেকে ৪০.৬, চিনি ১০.৪ থেকে ৯৫.১ এবং মশলা ৩.২ থেকে ২৮.৮ কোটি ডলার হয়েছে। অর্থাৎ পনেরো বছরের ব্যবধানেই অর্থমূল্যের হিসাবে ডাল ২.৮ গুণ, ভোজ্য তেল ৪.৮ গুণ, তেল বীজ প্রায় ৮ গুণ এবং চিনি ও মশলা ৯ গুণ বেশি আমদানি করতে হচ্ছে। আর এই ছয় ধরনের খাদ্যের মিলিত আমদানি ব্যয় ২০০২-০৩ সালের ৯০.৭ কোটি ডলার থেকে প্রায় ৫.৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে ৫১৪.২ কোটি ডলার হয়েছে। এছাড়া ধানের জমির প্রসার যে অন্যান্য অপ্রধান ও অচাষকৃত শস্য ও অশস্য তথা জীববৈচিত্র্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা বলাই বাহুল্য।

বছর	আমদানির পরিমাণ (কোটি মার্কিন ডলারে)						
	গম	ভোজ্য তেল	তেল বীজ	ডাল জাতীয়	চিনি	মশলা	মোট
২০০২-০৩	১৯.৮	৩৬.৪	৬.৪	১৪.৫	১০.৪	৩.২	৯০.৭
২০০৫-০৬	৩০.১	৪৭.৩	৯	১৬.৪	১২.৪	৩.২	১১৮.৪
২০০৮-০৯	৬৪.৩	৮৬.৫	১৫.৯	২৩.৪	৪১.৩	৬.২	২৩৭.৬
২০১১-১২	৬১.৩	১৬৪.৪	১৭.৭	২৪.৩	১১৭.৭	১৩.৮	৩৯৯.২
২০১৪-১৫	১০১.৯	১৫৭.৪	৩৫.৪	৩৯.৪	৭৪.৩	২১.৫	৪২৯.৯
২০১৭-১৮	১২২.৭	১৭৬.১	৫০.৯	৪০.৬	৯৫.১	২৮.৮	৫১৪.২



সারণি ৪ ও গ্রাফ ৩: খাদ্য আমদানির পরিমাণ

(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক[৩৬])

২০১৯ সালের ২২ নভেম্বর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আবদুল মুঈদ সরকারি নিরাপদ ফসল বিক্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেন, "এক সময় 'বোকার ফসল পোকায় খায়' এমন কথা বলে আমরা কৃষকের হাতে বিনামূল্যে ডিডিটি, এলড্রিন জাতীয় ক্ষতিকর কীটনাশক তুলে দিয়েছি। সেটা ছিল বিজ্ঞানের আর্শীবাদ নয়, অভিশাপ। অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্যে অধিক বালাইনাশক ব্যবহার করতে গিয়ে আমাদের শরীরে বিষ জালিকার মত প্রবেশ করছে, হচ্ছে হার্ট কিডনী সহ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নানান রোগ। এখন আমাদের বাঁচতে হবে এবং বাঁচাতে হবে পরবর্তী প্রজন্মকে।"[৩৮]

এখন গ্রাম বাংলার অধিকাংশ কৃষক পরিবারের নিত্য সঙ্গী হচ্ছে কিস্তী । কৃষি জ্ঞানের পরম্পরাগত প্রবাহে ছেদ পড়াতে তাদের "সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম)", "সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা (আইসিএম)" বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে হচ্ছে। বন্ধু পোকা আর শত্রু পোকা চেনানোর কার্যক্রম নেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের আয়বৈষম্য পরিমাপক গিনি সহগ ০.৪৮, যা ১৯৭২ সালে ছিল ০.৩২। উচ্চ বৈষম্যের এই দেশের কৃষকের সন্তান আর কৃষক হতে চাই না। কৃষক হওয়ার চেয়ে শহরে বা বিদেশে শ্রমিক হওয়া বা চাকুরী বেশি কাঙ্ক্ষিত।

কৃষিতে এই যে পরনির্ভরশীলতা বা পরমুখাপেক্ষীতা তার জন্য হয়তো আমাদের দেশে কার্যকরী কৃষক সংগঠন গড়ে ওঠেনি। সংগঠন বিষয়ে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেছেন, "যে জাতি নিজের ভাগ্যকে নিজে নির্মাণ করে না- সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে তার দুর্বলতা থেকে যায়। আমাদেরও আছে। নিজেকে নিজের চেয়ে বড় করে তোলার জন্যই তো সংগঠন। অসংখ্য মানুষের সুশৃঙ্খল বিন্যাসকে সংঘবদ্ধ করে নিজেদের শক্তিকে শতগুণ করে তোলার জন্যই তো সংগঠন।"[৩৯]

১৯৭০ সালে রকফেলার ফাউন্ডেশনের প্রস্তাবনা ছিল ইরি-র মত কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি নেটওয়ার্ক বা সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান তৈরি করা। পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান (FAO) ও ইউএনডিপি-র (UNDP) সহায়তায় ১৯৭১ সালে উন্নয়নশীল দেশসমূহের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে সিজিআইএআর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরি ছাড়াও আরও ১৪ টি আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে, যেগুলো ধান, ভুট্টা, গম, আলু, মৎস্য সম্পদ, প্রাণি সম্পদ, পানি, বন, কৃষি-বনায়ন, জীববৈচিত্র্য, অঞ্চল ও আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি, কৃষি পলিসি প্রভৃতি নিয়ে কাজ করছে। বিগত কয়েক দশক ধরে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ, গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রচারণার পরও সিজিআইএআর-এর মতে বর্তমান বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থা বিপজ্জনক ও সংকটময় পথ অতিক্রম করছে। প্রতিষ্ঠার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরও তাদের মনে হচ্ছে, আমরা যেভাবে খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাত, বিপণন ও গ্রহণ করি, তা মানবতার জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কারণ এখনও বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ হয় কম খাচ্ছে, না হয় বেশি খাচ্ছে, অথবা ভুল খাবার খাচ্ছে। আর এই খাবার উৎপাদন করতে যেয়ে পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যগত দিক থেকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। তাদের মতে সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমালা (SDG) অর্জনের জন্য আমাদের এমন খাদ্য-ব্যবস্থা প্রয়োজন যেখানে একই সাথে পরিবেশগত ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা যাবে, আবার অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনও সম্ভব হবে। এর জন্য খাদ্য, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ককে নতুনভাবে সাজাতে হবে।

২০০৮ সালে বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন, বিগত কয়েক দশক ধরে চলা কৃষি উন্নয়নের অগ্রগতি ও ফলাফল বোঝার জন্য একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এই IAASTD প্রতিবেদন[৩৭] অনুযায়ী বিগত কয়েক দশকে কৃষিবিজ্ঞানের মূল চিন্তা ছিল নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, যার ফলে কৃষি উৎপাদন কয়েক গুণ বেড়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র মানুষেরা, যারা এই উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও সবচেয়ে কম লাভবান হয়েছে, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি। বর্তমানে পৃথিবীতে একদিকে যেমন অসম উন্নয়ন হচ্ছে, অন্যদিকে দারিদ্রতা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো থেকেই যাচ্ছে। এই প্রতিবেদনে স্থানীয় ইকোসিস্টেম ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রেখে সেই, অনুযায়ী বৈচিত্র্যপূর্ণ চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন এবং পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন ও সুস্থায়ীত্বের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়।



ধান চাষের সমস্যা

১৯৭৯-৮১ সালে এ দেশে ধান ফসলের রোগসমূহের ওপর এক জরিপ করে ২০টি রোগ শনাক্ত করা হয়েছিল, পরবর্তীতে আরও ১২টি রোগের সন্ধান পাওয়া যায়।[৪০] এই ৩২টি রোগের মধ্যে ২৪টি ছত্রাকজনিত, ২টি ব্যাকটেরিয়াজনিত, ৩টি ভাইরাসজনিত এবং ৩টি কৃমিজনিত রোগ।[৪১] সাধারণভাবে ১০টি রোগকে প্রধান রোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়: খোল পোড়া, ব্লাস্ট, পাতা পোড়া, টুংরো, উফরা, বাদামি দাগ, খোল পচা, বাকানি, লালচে রেখা ও পাতা ফোস্কা।[৪২] মৃত্যুঞ্জয় রায় লিখিত "ধানের রোগ" বই থেকে আরও জানা যায় যে, স্থানীয় জাতের ধানসমূহের চাষ কমে যাওয়া, উফশী ধানের চাষ বেড়ে যাওয়া, জমিতে অধিক নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার প্রভৃতি রোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।[৪৩] এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চেনা প্রকৃতির অচেনা আচরণ ও নানান দুর্যোগ কৃষকের চাষাবাদকে বাধাগ্রস্ত করছে।

এছাড়া ধানচাষীরা বর্তমানে নানান ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। ধান চাষের কয়েকটি প্রধান সমস্যা[৪৪] নিচে তুলে ধরা হলো:

বালাই ও রোগ

নিবিড় ধান চাষে বিশাল এলাকা জুড়ে একই জাতের উচ্চফলনশীল ধান চাষ করা হয়। এর ফলে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক, সেচ এবং যন্ত্রের উপর নির্ভরতা ক্রমে বাড়তে থাকে। এভাবে ঐতিহ্যবাহী ধান চাষ পদ্ধতি থেকে সরে আসায় ঐ অঞ্চলের কৃষি-ইকোসিস্টেম এবং জীববৈচিত্র্য বদলে যায়। ফলে গাছের স্বাস্থ্যজনিত নানান সমস্যা দেখা দেয় এবং মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। যা উৎপাদন ও দীর্ঘমেয়াদী সুস্থায়ীত্বের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। একই জাতের ধানচাষ (মনোকালচার) এবং মিশ্র চাষ পদ্ধতি কমে যাওয়ার দরুণ, ধান গাছে রোগ-পোকার প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি বেড়ে যায়। ঐ জাতে আক্রমণ করতে পারে এমন যে কোন জীবাণু বা শত্রু পোকা, সহজেই পুরো ক্ষেতে ছড়িয়ে যেতে পারে।

এছাড়া আধুনিক ধান চাষের আবশ্যক উপাদান কৃত্রিম রাসায়নিক সার ও বিষের ব্যবহারের ফলেও বালাইজনিত নানা সমস্যা দেখা দেয়। ধানগাছের পাতা-খেকো পোকাদের জন্য যে বিষ প্রয়োগ করা হয়, তা ধানক্ষেতের জীববৈচিত্র্যের খাদ্য-জাল তৈরিতে বাধা দেয় এবং পরবর্তীতে ঐ পোকার আক্রমণ বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে সত্তরের দশকের বাদামী ঘাস ফড়িং এর আক্রমণের উদাহরণ দেওয়া যায়। এই পোকার সংখ্যা সাধারণত এর বিভিন্ন প্রাকৃতিক শত্রুরা সীমিত পর্যায়ে রাখে। কীটনাশক বিষ প্রয়োগের ফলে বাদামী ঘাস ফড়িং এবং তাদের প্রাকৃতিক শত্রুরা সবাই মরে যায়। কিন্তু ধানগাছের কান্ডের ভেতরে থাকা বাদামী ঘাস ফড়িং এর ডিম তুলনামূলক অক্ষত থাকে। সেই ডিম থেকে যখন শূককীট বের হয়, তারা শত্রুমুক্ত পরিবেশে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। কীটনাশক বিষ একেবারেই প্রয়োগ না করা ক্ষেতে বাদামী ঘাস ফড়িং এর সংখ্যা, বিষ প্রয়োগ করা ক্ষেতের তুলনায় আহামরি পর্যায়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। এছাড়া ধানের শত্রু পোকারা স্প্রে করা বালাইনাশকের সাথে টিকে থাকার মত প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার সামর্থ্য রাখে, যার ফলে আরও কড়া ডোজ বা বিষ প্রয়োগ করতে হয়।

বেশি বেশি রাসায়নিক সার প্রয়োগের কারণেও পোকা ও রোগের অধিক উপদ্রব দেখা দিতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে বেশি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা শস্যের শত্রু পোকারা বেশি ডিম পাড়ে, তুলনামূলক ভালভাবে ও বেশিদিন বাঁচে এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উচ্চ মাত্রায় সার প্রয়োগ মাটির অণুজীব বৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করে এবং দীর্ঘমেয়াদে উর্বরতা শক্তি কমিয়ে দেয়। এছাড়া এর ফলে ভূগর্ভের পানি দূষিত হয় এবং জলাশয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করে।

পানি সংকট

অন্য যে কোন দানাশস্যের চেয়ে ধানচাষে বেশি পানি লাগে। এক কেজি ধান উৎপাদন করতে পাঁচ হাজার লিটার পর্যন্ত পানি খরচ হতে পারে। এশিয়া মহাদেশে ব্যবহৃত মিঠা পানির প্রায় অর্ধেক খরচ হয় কৃষিতে সেচের প্রয়োজনে। আর সেচের পানির নব্বই ভাগই লাগে ধানক্ষেতে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলেও এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষিজমিতে খরা-প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধানচাষে অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে পানি সংকট।

লবণাক্ততা

উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার প্রকোপ বৃদ্ধি ধানচাষের আরেকটি সমস্যা। সেচের জন্য নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভের পানি তোলার ফলে মিঠা পানির স্তর নেমে যায় এবং মাটির নিচ দিয়ে সাগরের লবণাক্ত পানি স্থলভাগে প্রবেশ করে।

শিল্পায়নের কারণে কৃষিজমি হ্রাস

এশিয়ার দ্রুত বিকাশমান শিল্পখাত এবং শহরায়নের কারণে কৃষিজমি বসতবাড়ি ও শিল্প-কারখানায় পরিণত হচ্ছে। উর্বর কৃষিজমির এই রূপান্তরের ফলে অনেক ধানচাষী প্রান্তিক জমিতে আবাদ করতে বাধ্য হচ্ছেন, যা উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।



নওগাঁতে জমির উপরের স্তরের উর্বর মাটি ইটভাটায় ব্যবহারের জন্য নেওয়া হচ্ছে



জিন প্রকৌশলজাত ধান[৪৫]

কৃষি-রাসায়নিক শিল্পগোষ্ঠী ধানচাষের প্রায় সকল প্রধান সমস্যার সমাধান হিসাবে জিন প্রকৌশলকে উৎসাহ যোগাচ্ছে। ধানে পুষ্টি উপাদান যোগ করে তারা পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানুষের আহার যোগাতে চায়। তবে এর মাধ্যমে কৃষি-ব্যবসায়ি কর্পোরেশনগুলো বীজের উপর নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলছে। হাজার হাজার কৃষি-প্যাটেন্ট, রাসায়নিক শিল্পের মালিকানা এবং পৃথিবীর বীজ ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। আর খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ মানে সরকার, নাগরিক এবং দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ। এ কারণে নেতৃস্থানীয় বহুজাতিক বীজ কোম্পানিগুলো জিন প্রকৌশলজাত শস্য উদ্ভাবন ও প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রচুর বিনিয়োগ করছে। অথচ এটি উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য হুমকিস্বরূপ। এছাড়া এটি জৈব কৃষি ও অন্যান্য সামাজিক সুস্থায়ী কৃষি পদ্ধতিগুলোর জন্য বাধাস্বরূপ।

জিন প্রকৌশল একটি অপ্রয়োজনীয় এবং ঝুঁকিপূর্ণ গবেষণা, বিশেষ করে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জিন প্রকৌশলজাত খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কোডেক্স গাইডলাইন অনুযায়ী এই পদ্ধতি অনিশ্চিত এবং অপ্রত্যাশিত যে কোন কিছু ঘটতে পারে। জিন প্রকৌশল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রবেশ করানো জিনের মাল্টিপল কপি হয়ে যেতে পারে, জিন অগ্রবর্তী বা

উল্টোভাবে থাকতে পারে, ভেক্টরের মাধ্যমে জিনের ক্ষুদ্র অংশ স্থানান্তরিত হতে পারে এবং মিউটেশন হতে পারে। প্রায়ই গাছের ডিএনএ মুছে যায় বা পুনর্বিন্যাস্ত হয়ে যায়। এই প্রভাবগুলো জিন প্রকৌশলের জন্মগত বা সহজাত বিষয়। এছাড়া আরও যা হতে পারে:

- গাছের নিজস্ব জিনের ভাঙ্গন বা সংহতিনাশ এবং তাদের অস্বাভাবিক ক্রিয়া-এর মাধ্যমে অপ্রত্যাশিত বিষ বা এন্টি-নিউট্রিয়েন্ট তৈরি হতে পারে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।
- নতুন জিনের অন্তর্ভুক্তির ফলে গাছের নিজস্ব জিনের কার্যক্রম বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে-এর দরুণ গাছের প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হওয়া বিষ, এলার্জেনিক প্রোটিন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদার্থের পরিমাণ বাড়তে বা কমতে পারে।
- মাল্টিপল কপি থাকলে পরবর্তী প্রজন্মের গাছে জিন নিষ্ক্রিয় হতে যেতে পারে।

জিন প্রকৌশলজাত ধান বাণিজ্যিকভাবে ছাড় করা হলে অন্যান্য ধান শস্য ঐ শস্যের প্রভাবে দূষিত হবে। এছাড়া ধানের আদিম জাতগুলোও দূষিত হতে পারে। যদিও ধান স্বপরাগায়নকারী উদ্ভিদ, তারপরও বায়ু প্রবাহের কারণে ধানের রেণু একশ মিটার পর্যন্ত যেতে পারে। জিনের প্রবাহ বা আউটক্রসিং তেতাল্লিশ মিটারে দেখা গেছে। তাই আশেপাশের জিন প্রকৌশলজাত নয় এমন ধানে দূষণ প্রায় অবধারিত। এছাড়া দূষণের অন্যান্য সম্ভাব্য উৎস:

ধানের আগের ফসল: এশিয়ার অনেক এলাকাতেই, একই জমিতে কৃষকরা একাধিকবার কখনও ৩ বার পর্যন্ত ধান চাষ করেন। ফসল তোলার সময় জমিতে ঝরে পড়া ধান থেকে পরের দুই বছর বা তারও বেশি সময় পর্যন্ত ধান গাছ হতে পারে। অর্থাৎ একবার জিন প্রকৌশলজাত ধান চাষ করা হলে, এবং পরবর্তী মৌসুমে অন্য ধান করা হলে, দুই বছর বা তার বেশি সময় পর্যন্ত অন্য ধানের দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

মানুষের নাড়াচাড়া, আচরণ ও ত্রুতি: ধানের ফসল তোলার সময়, সাপ্লাই চেইনের নানা পর্যায়ে (পরিবহনে, গুদামে, প্রক্রিয়াজাতকরণে, বিপণনে) দূষণ হতে পারে। ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ধানের এরকম দূষণের কথা জানা গেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি ও আরকানসাস রাজ্যে বাণিজ্যিক চালের গুদামে আবর্জনা রাখার পাত্রে জিন প্রকৌশলজাত লম্বা দানার ধান পাওয়া যায়, যেটি বেয়ার উদ্ভাবিত এক ধরনের আগাছনাশক-সহনশীল জিন প্রকৌশলজাত ধান এবং কোথাও মানুষের খাওয়ার জন্য অনুমোদন পায়নি। এই খবর পাওয়ার পরপরই জাপান তাৎক্ষণিক যুক্তরাষ্ট্র থেকে লম্বা দানার চাল আমদানী নিষিদ্ধ করে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মামলা করে। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, অননুমোদিত যেই জিন প্রকৌশলজাত ধানটি, গুদামে থাকা ২০০৫ সালে উৎপাদন করা ধানকে দূষিত করেছে, সেটি ২০০১ সালের পর আর চাষ করা হয়নি।

ধানের উৎপত্তি এশিয়া মহাদেশে, এখানে জিন প্রকৌশলজাত ধানের অনিয়ন্ত্রিত প্রসার ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে ধানের আদিম জাতগুলো ধানক্ষেতের আশেপাশে ঘাস হিসেবে পাওয়া যায়। যখন আদিম ও চাষ করা জাত একই এলাকায় পাওয়া যায়, তখন দীর্ঘ সময়ে তাদের মধ্যে সঙ্করায়ন (production of hybrids) অনিবার্য বিবেচনা করা হয়। তাই রোগ-সহনশীল বা বিশেষ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত জিন প্রকৌশলজাত ধানের ঐ বৈশিষ্ট্য অনিবার্যভাবে

আদিম জাতে স্থানান্তরিত হবে এবং আদিম জাত দূষিত হবে। যার ফলে সেগুলো সমস্যাজনক ঘাস হয়ে যেতে পারে। এছাড়া প্রাকৃতিক আদিম জাতগুলো বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে। ১৯২০ এর দিকে তাইওয়ানে ধানের আদিম জাতের বিলুপ্তির প্রধান কারণের একটি হচ্ছে চাষ করা জাতের সাথে এইরকম সঙ্করায়ন, অথচ এই আদিম জাতগুলো আগে এলোপাতাড়ি জন্ম নিত।

ধানের আদিম জাতের হারিয়ে যাওয়া বুনো ইকোসিস্টেম, প্রাণি, উদ্ভিদের জন্য হুমকিস্বরূপ। এছাড়া জিন সম্পদের এই বিলুপ্তি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রজনন কাজের জন্য বিরাট ক্ষতি। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছের বৈচিত্র্য যা দীর্ঘকাল ধরে সংরক্ষিত ছিল, হারিয়ে যাাওয়ার ফলে জনগণের পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের উপর অধিকার হুমকির মুখে পড়বে। নিচে কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা দেওয়া হল, যেগুলো ধানে যোগ করা হয়েছে। এর কোন্ একটিও বাণ্যিজিক চাষের অনুমোদন দেওয়া হলে, মানুষের খাদ্যের মধ্যে জিন প্রকৌশলজাত প্রাণের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটবে।

বিবি রাইস

বিবি রাইসে আফ্রিকার আদিম ধানের জাত *Oryza longistaminata* থেকে ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট প্রতিরোধী Xa21 নামক জিন যোগ করা হয়েছে। ধানের পানিবাহিত রোগ ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইট নিয়ন্ত্রণ করাই এই ধানের লক্ষ্য। তবে এই ধানের মাধ্যমে ধানচাষীরা কোন দীর্ঘমেয়াদী সুফল পাবেন না। কারণ একটি নির্দিষ্ট প্রতিরোধী জিনযুক্ত জাত বিশাল এলাকায় চাষ করা হলে ঐ প্রতিরোধে ভাঙ্গন ধরে এবং পরবর্তী প্রজন্ম আরও বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট এশিয়াতে এমন কোন আহামরি সমস্যা নয়। চীনের কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৬ এর আগের পাঁচ বছরে ধানী জমির মাত্র ১-২% অংশ ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইটে আক্রান্ত হয়েছিল। এমনকি প্রচলিত পদ্ধতিতেই ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট প্রতিরোধের সক্ষমতা অর্জন সম্ভব। ঐ প্রতিরোধী জিনটি প্রচলিত ব্রিডিং প্রক্রিয়া এবং মার্কার এসেসটেড সেলেকশন প্রক্রিয়াতেও ধানে প্রবেশ করানো সম্ভব। আই-আর-৬৪ থেকে উদ্ভুত এবং বিভিন্ন চাইনীজ হাইব্রিড জাতে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ বন্ধ করেও এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তাই জিন প্রকৌশল ব্যবহার করা এবং এই প্রক্রিয়ার স্বভাবজাত ঝুঁকি নেওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই।

বিটি রাইস

মাটিতে থাকা ব্যাকটেরিয়া ব্যাসিলাস থুরিঙ্গিয়েনসিস (*Bacillus thuringiensis*), সংক্ষেপে বিটি থেকে জিন নিয়ে ধানে যুক্ত করে বিটি রাইস তৈরি করা হয়েছে। গাছের কান্ড ছিদ্রকারী পোকা মারার উপযোগী বিষ ধান গাছের শরীরে তৈরি করার জন্য এই জিন যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বিটি গাছগুলো জীবিত থাকাকালীন সময় ধরে রাসায়নিকের কারখানা মত বিষ উৎপাদন করে যাবে। এশিয়ার ধানক্ষেতে প্রয়োগ করা ব্যাপক পরিমাণ কীটনাশকের পরিমাণ কমানোর জন্য বিটি রাইসের পক্ষে প্রচার চালানো হচ্ছে।

এছাড়া আরও কয়েক ধরনের জিন প্রকৌশলজাত বিটি রাইস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে, যেগুলো কিছুটা ভিন্ন ধরনের বিটি বিষ তৈরি করে।

বিটি রাইস খাদ্য হিসাবে নিরাপদ কিনা, তা মূল্যায়নের কোন পদ্ধতি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। জিনগত অদল-বদলের কারণে কোন ক্ষতিকর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন, যেমন কোন বিষাক্ত বা এলার্জিক প্রভাব, হয় কিনা তা এখনও অজানা। উত্তর আমেরিকাতে স্টারলিংক বিটি ভূট্টার এলার্জি ঝুঁকির কারণে মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

এছাড়া কোন জিন প্রকৌশলজাত বিটি রাইসের পরিবেশগত সমীক্ষার তথ্য জনগণের নাগালের মধ্যে নেই। তবে অন্যান্য জিন প্রকৌশলজাত বিটি শস্য, যেমন ভূট্টা এবং তুলার সমীক্ষা থেকে ধারণা করা যায় যে বিটি রাইসের গুরুতর পরিবেশগত প্রভাব থাকবে। চীনে বিটি তুলার ক্ষেতে উপকারী পরজীবির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে এবং বিভিন্ন ধরনের শত্রু প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে বিটি বিষ মাটিতে থেকে যায় এবং পোকা মারার ক্ষমতা ধরে রাখে, যা মাটির দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

চীনে বিটি তুলা চাষীদের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় ধান চাষীরা বিটি রাইস থেকে দীর্ঘমেয়াদে কোন উপকার পাবে না। কর্নেল ইউনিভার্সিটির ২০০৬ সালের চীনে বিটি তুলার গবেষণায় দেখা গেছে, বিটি তুলা চাষ ব্যাপকভাবে শুরু হওয়ার সাত বছর পর অন্যান্য শত্রু পোকার সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে সেগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য চাষীদেরকে এক মৌসুমে বিশ বার পর্যন্ত স্প্রে করতে হচ্ছে, যার দরুণ প্রচলিত তুলা চাষীদের চেয়ে আয় আট ভাগ কমে গেছে। যাই হোক পৃথিবীর কোথাও বিটি রাইস চাষের অনুমতি দেওয়া হয়নি, কিন্তু চীনে বেআইনিভাবে চাষের খবর পাওয়া গেছে।

বিটি রাইস অপ্রয়োজনীয়, কারণ ধানগাছের কান্ড ছিদ্রকারী পোকা এমন কোন প্রকট সমস্যা নয়। একটি বড় গবেষণায় দেখা গেছে এশিয়ার চাষীদের ক্ষেতে কান্ড ছিদ্রকারী পোকার কারণে মাত্র ২.৪% উৎপাদন কমে। এই পোকার ক্ষতি চোখে দেখা যায় তাই প্রায়ই ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে ধরা হয়। অথচ আধুনিক জাতগুলোর এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠার সামর্থ্য বেশি। চারা গাছের ২৫ ভাগ পর্যন্ত ক্ষতিও উৎপাদনের কোন আহামরি ঘাটতি ছাড়াই গাছ সহ্য করতে পারে, কারণ ক্ষতিগ্রস্ত অংশ নতুন অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এই পোকার কারণে ৫ ভাগ পর্যন্ত শীষ মারা গেলেও অধিকাংশ জাতের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য কোন কমতি হয় না, কারণ গাছ নিজেই এই ক্ষতি অন্যভাবে পুষিয়ে নেয়।

আগাছানাশক সহনশীল ধান

মনস্যান্টো ও বেয়ার কোম্পানি জিন প্রকৌশলজাত আগাছানাশক সহনশীল ধান তৈরি করেছে, যেগুলোর নাম যথাক্রমে রাউন্ডআপ রেডি রাইস (আগাছানাশক গ্লাইফোসেট সহনশীল) এবং লিবার্টি লিংক রাইস

(আগাছানাশক গ্লুফোসিনেট সহনশীল) । বেয়ার কোম্পানি সর্বত্র লিবার্টি লিংক রাইসের (LL62) অনুমোদনের সুযোগ খুঁজছে, যদিও এটি এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে চাষ ও খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের এবং কানাডাতে শুধুমাত্র খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য অনুমতি পেয়েছে । আগাছানাশক সহনশীল শস্যের ব্যাপক চাষের ফলে অনিবার্যভাবে আগাছানাশকের ব্যবহার, বিষাক্ত রাসায়নিকের উপর নির্ভরশীলতা এবং কৃষকের খরচ বাড়বে । এছাড়া জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর আগাছানশকের নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে । যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের নয় বছরের তথ্য নিয়ে করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে, আগাছানাশক সহনশীল রাউন্ডআপ রেডি সয়াবিন চাষীরা প্রচলিত সয়াবিন চাষীদের তুলনায় বেশি রাসায়নিক ব্যবহার করেন এবং কম ফলন পান । এই গবেষণায় আরও পাওয়া গেছে যে, আগাছাও এখন আগাছানাশক সহনশীল, বিশেষ করে গ্লাইফোসেট, হয়ে যাচ্ছে, যা যুক্তরাষ্ট্রে একটি বড় সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে । এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার মত অন্যান্য গ্লাইফোসেট ব্যবহারকারী দেশেও একই পরিণতি দেখা যাচ্ছে ।

উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের উপর এই আগাছানাশক এবং আগাছানাশক সহনশীল শস্যের ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে । একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় দেখা গেছে জিন প্রকৌশলজাত আগাছানাশক সহনশীল শস্যের চাষের ফলে, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রজাতির প্রাণীদের সংখ্যা কমে গেছে । যুক্তরাজ্যের একটি আগাছানাশক সহনশীল শস্য চাষ করা খামারে এই গবেষণার ফলাফল পুনরায় পরীক্ষা করা হয়েছিল । সেখানে দেখা গেছে জিন প্রকৌশলজাত রাইসরিষা ও বিট চাষের ফলে বড় পাতা হয় এমন ঘাস কমে গেছে । এসব ঘাসের ফুলের আকর্ষণে নানান পোকা আসে এবং বিভিন্ন পাখিদের জন্য এসব ঘাসের বীজ গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য । গবেষণায় অন্যান্য খামারের তুলনায় ঐ খামারে পাখি ও পোকা বৈচিত্র্যের তাৎপর্যপূর্ণ কমতি দেখা গেছে । জিন প্রকৌশলজাত আগাছানাশক সহনশীল জাতের শস্য প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য আগাছানাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি করা । এর মাধ্যমে রাসায়নিক কৃষিকে উৎসাহিত করা হয়, যার দরুণ খামারের জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়ে যায় । কিন্তু বাড়তি ঘাস নিয়ন্ত্রণের জন্য নানান রকম ঐতিহ্যবাহী ও সাংস্কৃতিক চর্চা রয়েছে, যেখানে আগাছানাশকের কোন প্রয়োজন নেই এবং খামারের আয় বৃদ্ধি পায় ।

গোল্ডেন রাইস

এনডোসপার্মে বেটা ক্যারোটিন বা প্রো-ভিটামিন এ উৎপাদনকারী এক ধরনের জিন প্রকৌশলজাত ধানের নাম দেওয়া হয়েছে গোল্ডেন রাইস । ধানের দানার অনাকাঙ্ক্ষিত হলুদ রং থেকে এই নাম দেওয়া হয়েছে । মূলত উন্নয়নশীল দেশের মানুষের ভিটামিন এ-র ঘাটতির ভয়াবহ সমস্যা সমাধানের জন্য এই ধান তৈরি করা হয়েছে । ভিটামিন এ-র ঘাটতির কারণে মানুষ আংশিক বা পুরোপুরি অন্ধত্বের শিকার হয় । বৈজ্ঞানিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, জিন প্রকৌশল শিল্প-গোষ্ঠী গোল্ডেন রাইসের প্রসারের জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে । গোল্ডেন রাইসের প্রো-ভিটামিন এ-র পরিমাণ বা গোল্ডেন রাইস খাদ্য হিসেবে নিরাপদ কিনা, তা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক আছে । জিন প্রকৌশলের জটিলতা এবং গাছের ভেতরের বিপাকীয় পরিবর্তনের হার, অপ্রত্যাশিত ও

অনিশ্চিত ফলাফলের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং মানুষের খাদ্য নিরাপদ থাকবে কিনা তা নিয়ে নানান দুশ্চিন্তা তৈরি হচ্ছে। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে এশিয়ার মানুষ যতটুকু ভাত খায় তার মাধ্যমে যথেষ্ট প্রো-ভিটামিন এ পাওয়া যাবে, তারপরও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভিটামিনের চাহিদা পূরণের জন্য গোল্ডেন রাইস কোন সমাধান হতে পারে না। মানুষের অন্ত্রে প্রো-ভিটামিন এ কাজ করার জন্য ডায়াটারি ফ্যাট থাকা প্রয়োজন। তাই মানবদেহে বেটা ক্যারোটিন গ্রহণ ও পরিবহনের জন্য যেমন সক্রিয় পরিপাকতন্ত্রে যথেষ্ট প্রোটিন ও ফ্যাট থাকা প্রয়োজন, তেমনি প্রতিদিনের খাবারের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি, প্রোটিন ও ফ্যাট থাকা দরকার। অনেক শিশুরই ভিটামিন এ-র ঘাটতি দেখা যায়, যদিও আসলে তারা প্রোটিন ও শক্তির অভাবে অপুষ্টিজনিত কারণে এবং পেটের ইনফেকশনের কারণে বেটা ক্যারোটিন শোষণ করতে পারে না বা বেটা ক্যারোটিনকে ভিটামিন এ-তে রূপান্তর করতে পারে না।

যদি ব্যাপকভাবে গোল্ডেন রাইস চাষ শুরু হয়, তাহলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের পেছনের জটিল সামাজিক কারণগুলোকে অস্বীকার করা হবে এবং এর মাধ্যমে ক্ষুধা সমস্যার কোন সমাধান আশা করা যায় না। প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় শুধু একটি প্রধান খাবারকে উৎসাহিত করার ফলে অপুষ্টি আরও বেড়ে যাবে। তাত্ত্বিক লাভের উপর ভিত্তি করে ভিটামিন এ-র ঘাটতি দূর করার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জিন প্রকৌশলজাত গোল্ডেন রাইস চাষ ও খাবার হিসাবে গ্রহণ করার কোন যুক্তি নেই।

ভিটামিন এ-র ঘাটতি দূর করা এবং সবরকম পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি করার অন্যান্য কার্যকর উপায় আছে, যেমন বসতবাড়িতে ফসল চাষ, মিশ্র চাষ, কমিউনিটি গার্ডেনিং ইত্যাদি। এর মধ্যে বসতবাড়িতে শাক-সবজিসহ নানান রকম ফসল চাষ সবচেয়ে সম্ভাবনাময়, কেননা অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্তদের প্রায় ৫০ ভাগই ক্ষুদ্র কৃষক। আর অপুষ্টিদের আক্রান্তদের মাত্র ২০ ভাগ শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যাদের বসতবাড়িতে চাষাবাদের সুযোগ নেই। গবেষণায় পাওয়া গেছে ৭৫ গ্রাম পুঁইশাকের মধ্যেই এক দিনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রো-ভিটামিন এ আছে। পুঁইশাক আমাদের দেশে সারা বছর চাষ করা যায় এবং দামেও সস্তা। এছাড়া দুই টেবিল-চামচ হলুদ মিষ্টি আলু, অর্ধেক কাপ গাঢ় সবুজ শাক বা মাঝারি আকারের আমের দুই-তৃতীয়াংশ দৈনিক খেলেই স্কুলে ভর্তি হবে এমন শিশুদের প্রতিদিনের ভিটামিন এ-র চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। নানান রকম ফল ও শাক-সবজির মধ্যে শুধু ভিটামিন এ নয়, অন্যান্য প্রয়োজনীয় অণু-পুষ্টিও আছে। এছাড়া পাটশাক, সরিষা ও সাজনা ইত্যাদি সহজেই পাওয়া যায় বা চাষ করা যায়, যেগুলোতে সমপরিমাণ গোল্ডেন রাইসের চেয়ে বেশি বেটা ক্যারোটিন আছে। অথচ অপুষ্টি ও ভিটামিন এ-র ঘাটতি পূরণের প্রকৃত সমাধানগুলো থেকে আমাদের মনোযোগ ও অর্থায়ন গোল্ডেন রাইসের দিকে চলে যাচ্ছে।

জিন প্রকৌশল: কাদের লাভ?[৪৬]

২০০৬ সালে জাতিসংঘের তৎকালিন মহাসচিব কফি আনান ওয়ার্ল্ড ফুড সামিটে বলেছিলেন: এই পৃথিবীতে খাদ্যের কোন ঘাটতি নেই। অর্থাৎ সকল মানুষ যেন দৈনিক যথেষ্ট পরিমাণে, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য পায়,



সেজন্য আমাদের কাজ করা উচিৎ। এজন্য খাদ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ কমিউনিটি ও কৃষকদের হাতে রাখা দরকার, যাতে তারা সত্যিকারের সুস্থায়ী ফসল ও খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারেন। ভোক্তা এবং কৃষকদের অধিকারকে পৃষ্ঠপোষকতা করার পরিবর্তে কৃষিতে জিন প্রকৌশলকে উৎসাহিত করার কারণ হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশে খাদ্যের উপর কর্পোরেট গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য জিন প্রকৌশল নিয়ে কাজ করা কর্পোরেশনগুলো তীব্র প্রতিযোগীতায় লিপ্ত। জিন প্রকৌশলজাত নানান ফসল তৈরি, চাষ ও প্রচারের মাধ্যমে কৃষি-রাসায়নিক কোম্পানিগুলো আরেক দফা পুঁজি সঞ্চয়নের পথে রয়েছে। বীজ হচ্ছে উৎপাদনের মূল নিয়ামক। ক্রমে বীজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, জিন প্রকৌশল নিয়ে কাজ করা কোম্পানিগুলো তাদের তৈরি করা বালাইনাশক, সার ও ইত্যাদি ব্যয়বহুল কৃষি উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য ফসলের ডিএনএ বা জিন-বিন্যাস পরিবর্তন করে দিচ্ছে। জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে প্রযুক্তির, বিশেষ করে বেসরকারি খাতের জৈবপ্রযুক্তির উপর, নির্ভরতা ও কৃষিতে রাসায়নিকের ব্যবহার আরও বাড়ছে। রাসায়নিক নির্ভর এক ফসলের চাষ বা মনোকালচার কৃষি চর্চার জন্য কিছু নির্দিষ্ট প্রযুক্তির পেছনে অর্থ বরাদ্দ ও গবেষণা করা হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য এজন্য খাদ্য সংকটের কথা বলা হয়। দারিদ্র্যতা, ক্ষুধা এবং কৃষিজমির অবক্ষয়ের অন্তর্নিহিত কারণগুলোকে পাশ কাটিয়ে জিন প্রকৌশলকে একমাত্র সমাধান হিসাবে সামনে নিয়ে আসা হয়। সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত দিক থেকে মানানসই বিকল্প কৃষি পদ্ধতি, যেমন জৈব কৃষি, জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি বা এগ্রোইকোলজি অথবা সামাজিক বা কমিউনিটি কৃষি ইত্যাদির পেছনে অপ্রতুল সরকারি ও গবেষণা সহযোগিতা রাখা হয়। শিল্পায়িত কৃষির ভেতরের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত

করার পরিবর্তে, রাসায়নিক কোম্পানিগুলো ক্রমাগত রাসায়নিক নির্ভর কৃষিতে অর্থ বরাদ্দ দিতে থাকে এবং পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পার্টনারশিপ গড়ে তোলে। যার ফলাফল:

- এক ফসলের চাষ বা মনোকালচারের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে
- উদ্ভিদ ও খাদ্য বৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে
- কৃষকের চাষের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে
- রাসায়নিকের উপর নির্ভরতা বেড়েছে
- পরিবেশের এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়
- ব্যয়বহুল ও বেমানান প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা।



চলছে ধান মাড়াই



ধানের পুষ্টি ও অন্যান্য ব্যবহার

ঐতিহাসিক আলামত থেকে ধারণা করা যায় যে মানুষ প্রায় দশ হাজার বছর ধরে ধান চাষ ও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে। বাংলাদেশের মানুষ ধান থেকে ভাত, মুড়ি, চিড়া, খৈ, রুটি, মিষ্টান্ন, পিঠা, পানীয় ইত্যাদি নানান খাবার তৈরি করে। ভাতের আবার নানা ধরন আছে: সাধারণ ভাত, জাউ ভাত, পান্তা ভাত, পোলাও, বিরিয়ানি, তেহারী, খিচুড়ি ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সাবেক মহাপরিচালক জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাসের মতে, "ভাতে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট থাকে, যা মানবদেহে দ্রুত শক্তি যোগায়। ভাতে চর্বি কম থাকে এবং কোন ক্ষতিকর কোলেস্টেরল বা সোডিয়াম থাকে না। তাই এটি উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট এটাক ও ব্রেইন স্ট্রোকের মত রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী। ভাতে প্রচুর অদ্রবণীয় আঁশ থাকে যা পেট পরিস্কার রাখে ও ক্যান্সার-প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া ভাতে থাকা প্রাকৃতিক এন্টি-অক্সিডেন্ট ও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান মানুষের জন্য খুবই উপকারী। তবে বেশি পালিশ করা চাল বা সাদা ভাতে পুষ্টি উপাদান তুলনামূলক কম থাকে। ধান বিভিন্ন রং এর হয়ে থাকে, এর মধ্যে কালো ধানের চালে পুষ্টি উপাদান তুলনামূলক বেশি থাকে বলে শোনা যাচ্ছে। কালো ধানের চাল কালোই হবে এমন নয়, বিভিন্ন জাতের কালো ধানে বাদামী, বেগুনী, কালো ইত্যাদি নানান রং এর চাল পাওয়া যায়, যা নির্ভর করে এন্থোসায়ানিন নামক এন্টি-অক্সিডেন্টের ঘনত্বের উপর। অন্যান্য রং এর চালের তুলনায় কালো চালে বেশি আঁশ, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ ও এন্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায়। এসব উপাদান কোষ্টকাঠিন্য, হজমের সমস্যা, অকাল বার্ধক্য, চোখ ও ত্বকের সমস্যা, হার্ট এটাক, স্ট্রোক, ক্যান্সার

প্রতিরোধে কার্যকরী এবং শরীরের দূষিত পদার্থ পরিষ্কার করে ও রোগ-প্রতিরোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তাই উন্নত দেশে কালো চালের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় জাতের কালো ধান চাষের ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রায় ৯০টি স্থানীয় কালো ধানের একটি সম্ভাব্য তালিকা আছে। এর মধ্যে কিছু ধানের চাল একেবারে কালো হতে পারে, আর বাকি ধানগুলোর চাল বাদামী বা বেগুনী। এই কালো, বেগুনী বা বাদামী রং এর চাল, সাধারণ সাদা চাল থেকে উত্তম।"[৪৭]

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) ওয়েবসাইট থেকেও একই তথ্য পাওয়া যায়। তবে চাল কলে বাদামী চালকে পালিশ করে সাদা চাল বানানোর সময় ভিটামিন ই, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি পুষ্টি উপাদান চলে যায়।[৪৮] চালের উপরিভাগের বাদামী অংশে ভিটামিন বি১, বি৩ ও বি৬, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস ইত্যাদি ভিটামিন ও খনিজ থাকে। এছাড়া সাদা চালের তুলনায় বাদামী চালে চার গুণ পর্যন্ত অদ্রবণীয় আঁশ থাকে, যা মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই দরকারি।[৪৯] কিন্তু ধান ভাঙ্গানোর সময় এই উপরের বাদামী স্তর ফেলে সরু ও সাদা করার ফলে ৮০% ভিটামিন বি১, ৬৭% ভিটামিন বি৩, ৯০% ভিটামিন বি৬, ৫০% ম্যাঙ্গানিজ ও ফসফরাস, ৬০% আয়রন এবং প্রায় সকল আঁশ ও প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড চলে যায়।[৫০] আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত গবেষণা থেকে জানা যায় যে, খন্ডিত দানাশস্যের (বাদামী চালকে পালিশ করা সাদা চাল) চেয়ে আস্ত দানাশস্য (বাদামী চাল), সুস্থ শরীর ও নিয়ন্ত্রিত ওজনের জন্য বেশি কার্যকরী। এছাড়া লাল বা বেগুনী চালে এন্টিঅক্সিডেন্ট বেশি থাকে। সাধারণত বাদামী চাল থেকে ভাত রান্না করতে সময় কিছুটা বেশি সময় প্রয়োজন হয়, তবে চাল ভিজিয়ে রাখলে রান্না হতে সময় কম লাগে। এক্ষেত্রে চাল ভেজা পানি ব্যবহার করেই ভাত রান্না করা উচিৎ, কারণ পানি ফেলে দিলে চালের পুষ্টি পানির সাথে চলে যাবে।

ধানের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বা জিআই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জিআই বেশি এমন খাবার গ্রহণ করলে রক্তে গ্লুকোজ বা চিনির পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যায়, আর চিনির পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি হলে রক্ত বিষাক্ত হয়ে যায় এবং এটি অন্ধত্ব, কিডনী নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ ও হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।[৫১] বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত 'ব্রি ধান২৯' বোরো মৌসুমের একটি ধানের জাত, যা ১৯৯৪ সালে চাষাবাদের অনুমতি প্রদান করা হয়। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মতে, গুণে ও মানে এটি আধুনিক ধানের সেরা এবং বোরো মৌসুমের সবচেয়ে জনপ্রিয় উচ্চফলন ক্ষমতা সম্পন্ন জাত (উফসি), যা চাষ করে কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও জিঙ্ক সার প্রয়োগ করতে হয়।[৫২] কিন্তু ২০০৯ সালের গবেষণায় দেখা গেছে এই ধানের চালের জিআই অনেক বেশি (৭০+)।[৫৩] ব্রি উদ্ভাবিত বোরো মৌসুমের আরেকটি জনপ্রিয় জাত 'ব্রি ধান২৮'-এর জিআই ৭০ এর কাছাকাছি। অর্থাৎ এই ধানের প্রসারের ফলে সারা দেশে উপরোক্ত রোগগুলোর প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেছে বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু উপরে উল্লেখিত গবেষণালব্ধ তথ্যের কথা দেশের জনসাধারণ এখনও জানে না। এমনকি বাংলাদেশে চালে ভিটামিন এ যুক্ত করার জন্য যে জিন প্রকৌশলজাত (জিএমও) গোল্ডেন রাইস অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলছে সেখানে ব্রি ধান২৯ ব্যবহার করা হচ্ছে।[৫৪] এছাড়া অন্যান্য জাতের জিআই নির্ণয় করা এবং জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার



ধান থেকে খৈ তৈরি করছেন এক গৃহিণী

করা জরুরি। এর পাশাপাশি যে কোন জাত কৃষক পর্যায়ে অবমুক্ত করার আগে সার্বিক পুষ্টি উপাদান এবং সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব ভালভাবে পরীক্ষা ও প্রচার করা জরুরি।

সুস্বাস্থ্য ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চাল বা অন্যান্য দানাশস্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে আয়রন (লৌহ), জিঙ্ক, কপার এবং ম্যাঙ্গানিজের মত উপকারী ধাতু থাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে আর্সেনিক, লেড ও মার্কারীর মত বিষাক্ত ধাতুর উপস্থিতি ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি ঘটাতে পারে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সেন্টার ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারী স্টাডিজ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ১,৪০০ ঐতিহ্যবাহি ধানের জাত সংগ্রহ করেছে এবং নিয়মিত চাষ করে বীজ সংরক্ষণ করছে।[৫৫] এই জাতগুলোর অধিকাংশই আধুনিক ধানের জাত চাষের প্রচলনের ফলে কৃষকের জমি থেকে হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। এর মধ্যে ১৩০টি স্থানীয় জাতের চালের মধ্যে ১২ রকম ভারী ধাতুর উপস্থিতির পরিমাণ পরীক্ষা করা হয়েছে।[৫৬] আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ইরি) উদ্ভাবিত উচ্চ-আয়রন সমৃদ্ধ ধানের জাতে (IR68144-2B-2-2-3) যেখানে প্রতি কেজিতে ৯.৮ মিলি গ্রাম আয়রন পাওয়া যায়, সেখানে পরীক্ষিত জাতের ৬৭ টিতে প্রতি কেজিতে ২০ মিলি গ্রামের বেশি এবং ৫১টিতে ৩০ মিলি গ্রামের বেশি আয়রন পাওয়া গেছে। এমনকি দুধে বোলতা ধানে প্রতি কেজিতে ১৩০.৯ এবং লাল গেতু ও ভুরি শুলাহ ধানে ৮৫ মিলি গ্রাম আয়রন পাওয়া গেছে। আবার যেগুলোতে বেশি আয়রন পাওয়া গেছে সেগুলোর অধিকাংশতেই নিকেল ও ক্রোমিয়ামও বেশি পাওয়া গেছে। এছাড়া ৩১টি জাতের ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ প্রতি কেজিতে ৪০ মিলি গ্রামের বেশি।

এই গবেষণায় ৯৮টি স্থানীয় জাতের ধানে ২০ মিলি গ্রামের বেশি এবং ২৪টিতে ৩০ মিলি গ্রামের বেশি জিংক পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, ব্রি উদ্ভাবিত বিশ্বের প্রথম জিংকসমৃদ্ধ ধানের জাত ব্রি ধান ৬২-তে প্রতি কেজিতে ১৯

মিলি গ্রাম জিংক পাওয়া সম্ভব হয়েছে।[৫৭] এর মধ্যে গরিবশাইল ধানে প্রতি কেজিতে ১৫৫.৩ মিলি গ্রাম জিংক পাওয়া গেছে। আরেকটি আশ্চর্যজনক ব্যপার হচ্ছে গরিবশাইল ধানটিতে প্রতি কেজিতে ১৫.৬১ মিলি গ্রাম রূপার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় এই ধানটি পশ্চিমবঙ্গের বিরভূম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এই পরিমাণ রূপা ধারণ করাটা কৃষিজ শস্যের জগতে অনন্য একটি ব্যাপার। বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকজ চিকিৎসায় পরিপাকতন্ত্রের ক্ষতের রোগিদের পথ্য হিসেবে এই চালের ভাত খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হতো। কিন্তু এসব জাত হারিয়ে যাওয়ার ফলে একদিকে আমরা যেমন আমাদের জীববৈচিত্র্য সম্পদ হারিয়ে ফেলছি, অন্যদিকে পুষ্টি ঘাটতি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার স্বল্পতার সম্মুখীন হচ্ছি। আগে চাল সংরক্ষণ করার জন্য পাত্রে নিমপাতা বা তেজপাতা রাখা হতো, যাতে পোকা না আসে। এ ধরনের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানও বিলুপ্তির পথে।

পুষ্টির প্রেক্ষিতে উচ্চফলনশীল ধান চাষের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় যে, এতে পুষ্টি কম থাকলেও অধিক ফলনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি থেকে স্থানীয় ধানের তুলনায় বেশি পুষ্টি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মানুষের ভাত খাওয়ার পরিমাণ তো বাড়ে না, ফলে সে পুষ্টিবঞ্চিত হতে পারে। আর কৃত্রিম রাসায়নিক সার, বিষ ও অন্যান্য বালাইনাশক ব্যবহার করে উৎপাদন করা ধানের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে এখন অনেকেই সচেতন। অনেকেই সুস্বাস্থ্যের জন্য, বা জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের কথা চিন্তা করে স্থানীয় চাল খোঁজেন। এ ধরনের বিপণন কেন্দ্রও বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে। কেউ আবার সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত পর্যায় ছাড়াও উবিনিগি, বারসিক, রিইব ইত্যাদি সংস্থা স্থানীয় ধানের কৃত্রিম উপকরণমুক্ত সুস্থায়ী চাষাবাদের প্রসারে কাজ করছে। স্থানীয় ধান চাষ করা কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এইসব ধানের ভাত তুলনামূলক সুস্বাদু এবং খাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও ক্ষুধা লাগে না। তবে শহুরে সংস্কৃতির প্রভাবে এইসব লাল, লালচে, বাদামী, কালচে, কালো বা সাদা ইত্যাদি বর্ণের ভাতের চেয়ে ধবধবে সাদা ও চিকন চালের ভাত বেশি অভিজাত বলে ধরে নেওয়া হয়। ঘরোয়াভাবে ধান থেকে মুড়ি, চিড়া, খৈ, মিষ্টান্ন ও নানান পিঠা ইত্যাদি বানানোর সংস্কৃতিও এখন বিলুপ্তির পথে। এই জায়গা দখল করেছে বাজারের চিপস্, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি মুখরোচক খাবার।

ধান ভাঙানোর জন্য ঐতিহ্যাবাহী ঢেঁকির জায়গা দখল করেছে অটো রাইস মিল। উবিনিগ-এর তথ্য মতে, ঢেঁকিতে ছাটলে এক মণ ধান থেকে প্রায় ২৪ কেজি চাল, ৯ কেজি তুষ, ৩ কেজি কুড়া ও ২ কেজি খুদ পাওয়া যায়। এগুলোর প্রত্যেকটিরই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার রয়েছে[৫৮] :

তুষ ঃ ঘরলেপা, রান্নার কাজে, মশা-মাছি তাড়ানোর জন্য গরুর ঘরে ধোয়া দেওয়া, শীতকালে আগুন জ্বালানো, চুলা লেপা, কাদার সাথে মিশিয়ে চুলা তৈরি, জ্বালানির জন্য গোবর ও তুষ মিশিয়ে কাঠি তৈরি করা, মুরগীর খামারে ব্যবহার, মুরগীর বাচ্চা ফোটানোর জন্য তুষের উপর ডিম দেওয়া, তুষের ছাই দিয়ে দাঁত মাজা ও হাড়ি-পাতিল মাজা, ডিম পরিবহন, নানা রকম ফল পাকানো, ভোজ্য তেল ইত্যাদি।

কুড়া ঃ গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, মাছের খাদ্য হিসেবে, কুড়া ও গোবর মিশিয়ে ধান রাখার গোলা লেপ দেয়া প্রভৃতি।

খুদ ঃ খুদের ভাত, ছাতু, মোয়া, পিঠা ইত্যাদি খাবার বানানো, নারিকেলের নাড়ু বানানোর সময় খুদ ভেজে মিহি করে বেটে নাড়ু শক্ত করার জন্য ব্যবহার, হাঁস-মুরগীর সদ্য ফোটা বাচ্চার খাবার ইত্যাদি ।

এছাড়া ধানের ঘর গবাদিপশুর খাদ্য ও নানান কাজে ব্যবহার করা হয় । তবে বিশাল এলাকা জুড়ে স্থাপিত অটো রাইস মিলের শব্দ, ছাই, তুষ, বায়ু ও অন্যান্য দূষণে আশেপাশের মানুষসহ জীববৈচিত্র্য অতিষ্ঠ হয়ে গেলেও, অনেকেই এখন মিলে ভাঙানো ধবধবে সাদা চালের উপর নির্ভরশীল । বাজারে মিনিকেট বলে যে জাতপরিচয়হীন চাল পাওয়া যায়, সেটিসহ অধিকাংশ চাল বিভিন্ন বিদেশী মেশিনের সাহায্যে এই মিলগুলোতেই ভাঙানো হয় । শহরের বাজারে নাজিরশাইল ধানেরই তিন রকম দামের চাল পাওয়া যায়, আর মিনিকেট পাওয়া যায় কয়েক রকম দামের । কোন ধান থেকে কোন চাল করা হচ্ছে তা অধিকাংশ ক্রেতাই জানেন না । লম্বা ও চিকন চালের কদর বেশি, তাই চালের উপরের অংশ ছেঁটে ফেলা হয় । কিন্তু উপরের আলাপে আমরা জেনেছি কম পালিশ করা চাল বেশি পুষ্টিকর ও উপকারী । এখনও গ্রামাঞ্চলে ধান ভাঙানোর কিছু ছোট মেশিন পাওয়া যায়, তবে ঢেঁকির সংখ্যা একেবারেই নগন্য । বাড়তি মেদ ঝরানোর জন্য ট্রেডমিলে দৌড়ানো ফ্যাশন হয়ে উঠলেও ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া অসম্মানের কাজ । কায়িক শ্রমকে ছোট করে দেখার যে উপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা শিক্ষিত হয়েছি তার মহিমা হচ্ছে যে যত বেশি শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করে তাকে তত নিচু চোখে দেখা হয় ।





জীববৈচিত্র্য নির্ভর ধানচাষ ও বালাই ব্যবস্থাপনা[৫৯]

সাধারণত ধানক্ষেতের ইকোসিস্টেমে নানান ধরনের শস্য ও অশস্য উদ্ভিদ, পোকা, শামুক, ঝিনুক, অণুজীব, পরজীবী এবং অন্যান্য প্রাণি থাকে। ইকোসিস্টেমের মধ্যেকার এসকল বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাদানসমূহের নিজেদের মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে (খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, প্রতিযোগিতার সম্পর্ক, সহযোগিতার সম্পর্ক ইত্যাদি)। তাই এখানে কোন একটি নির্দিষ্ট জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়া নির্ভর করে অন্য জীবগুলোর উপর। ধানগাছে ও ধানক্ষেতের মাটি বা পানিতে বসবাসকারী বিভিন্ন শিকারী প্রাণি ও পরজীবীরাই ধানের অধিকাংশ শত্রু বা বালাই নিয়ন্ত্রণে রাখে। ধানগাছের বেড়ে উঠার প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুধেপানা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণিদের খাওয়ার জন্য নানান পোকা আসে। এই পোকাদের খাওয়ার জন্য আবার বিভিন্ন শিকারী প্রাণিরা আসে এবং বংশবৃদ্ধি করে। বিরক্ত না করা হলে সাধারণত এসব প্রাকৃতিক শিকারীরা শস্যের শত্রুকে নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে রাখে, ফলে কোন বড় রকমের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় না।

উপরের তথ্যগুলো থেকে শস্যের বালাই (শত্রু পোকা, রোগ ও অন্যান্য) সমস্যা মোকাবেলার দুটো কৌশল পাওয়া যায়:

প্রথমত, ধানক্ষেতের ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য নষ্ট করে এমন কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকা।

দ্বিতীয়ত, ধানক্ষেতের জীববৈচিত্র্য আরও সমৃদ্ধ করার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

ধানগাছের বৃদ্ধির প্রথম দিকে বালাইনাশক বিষ প্রয়োগ করা হলে ধানক্ষেতের ইকোসিস্টেম সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এই চর্চা অবশ্যই পরিহার করা উচিৎ। এসময় কীটনাশক বিষ প্রয়োগ করা হলে ধানক্ষেতের ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। কীটনাশক প্রয়োগের ফলে ধানের শত্রু পোকার পাশাপাশি, ঐসব পোকাকে যেসব পোকা বা প্রাণীরা খায় তারাও মারা যায়। আবার এই পরিস্থিতির সাথে

ধানের উপকারী প্রাণিদের চেয়ে শত্রু পোকারা দ্রুত মানিয়ে ওঠে। অর্থাৎ কীটনাশক বিষ প্রয়োগের ফলে কৃষকের দুই ধরনের প্রাকৃতিক ক্ষতি হয়:

১. শস্যের বিভিন্ন বন্ধু প্রাণির সংখ্যা কমে যায়,

২. গাছের বিভিন্ন অংশ খায় এমন শত্রু পোকাদের সংখ্যা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়।

কীটনাশক স্প্রে করা ধানক্ষেতে বিষক্রিয়ার ফলে প্রাকৃতিক খাদ্য শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, কীটনাশক বিষ প্রয়োগের ফলে ধানগাছের বিভিন্ন অংশ খাওয়া শত্রু প্রাণিদের সংখ্যা যেখানে ১ ভাগ কমে, সেখানে ঐসব প্রাণিদের খায় এমন প্রাণির সংখ্যা ৪২-৩৭ ভাগ পর্যন্ত কমে যায়। এছাড়া দেখা গেছে উপকারী মাকড়সার পরিমাণ ৬১ ভাগ কমে গেলেও ধানের শত্রু পোকা প্ল্যান্ট হপারের সংখ্যা ২৩ ভাগ বেড়ে গেছে।

পৃথিবীতে বিক্রি হওয়া বালাইনাশকের ১২ ভাগ ব্যবহৃত হয় শুধু ধান ফসলে। অন্য কোন একক ফসলে এত বালাইনাশক দেওয়া হয় না। কৃষি-রাসায়নিক কোম্পানিগুলোর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ধানচাষীরা এবং বিভিন্ন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি কোম্পানিগুলোকে এই কাজে সহায়তা করে। মূলত কৃষিতে রাসায়নিক বিপ্লবের ফলে অল্প সংক্রমণ দেখা গেলেই চাষীরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বিষ প্রয়োগ করেন। এছাড়া যাতে কিছুতেই পোকা না আসতে পারে সেজন্যও রুটিনমাফিক বিষ প্রয়োগ করা হয়, বিশেষ করে গাছের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে। ধানচাষীরা প্রায়ই প্রকৃত ক্ষতির চেয়ে প্রায় দশ গুণ বেশি ক্ষতির আশঙ্কা করেন। ধানগাছের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে বিষ প্রয়োগ করা হয় বিভিন্ন পাতাখেকো পোকাদের মারার জন্য। অথচ এসব পাতাখেকো পোকার আক্রমণের ফলে অধিকাংশ সময়ই ফসলের কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় না। কারণ ধানগাছ নতুন পাতা ছেড়ে ও নানা ভাবে নিজেই এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে।

সফল ও সুস্থায়ী বালাই ব্যবস্থাপনায়, প্রাথমিক পর্যায়ে কীটনাশক বিষ প্রয়োগ কমানো এবং ধানক্ষেতের প্রাকৃতিক-জৈবিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে বাধাগ্রস্ত করে এমন অপ্রয়োজনীয় বিষ প্রয়োগ বন্ধ করার দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। এরকম বিষ দেওয়া বন্ধ করলে ফলনের কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হয় না। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) ধানক্ষেতে ২০০৩ সালে ১৯৯৩ সালের তুলনায় ৯৫ ভাগ বিষ প্রয়োগ কমানো সম্ভব হলেও ফলনের কোন কমতি হয়নি। এমনকি শত্রু পোকার আধিক্যও কমে গেছে। ভিয়েতনামে প্রাথমিক পর্যায়ে বিষ প্রয়োগ বন্ধে গণমাধ্যমের মাধ্যমে কৃষকদের সচেতন করার ফলে কীটনাশক প্রয়োগের পরিমাণ ৫৩ ভাগ কমেছিল, অথচ ফলন কমেনি। ফিলিপাইনে গবেষণা দেখা গেছে ধানচাষীদের স্প্রে করা বিষের ৮০ ভাগই ছিল অপ্রয়োজনীয়। সেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে কীটনাশক বিষ প্রয়োগ বন্ধের গবেষণায় অংশগ্রহণকারী কৃষকরা ৬০ ভাগ কীটনাশক প্রয়োগ হ্রাস করেছিলেন।

ধানক্ষেতের ইকোসিস্টেমের সংহতি নষ্ট করে এমন আরেকটি চর্চা হচ্ছে অতিরিক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ করা, বিশেষ করে নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া সার। ধানগাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টির চেয়ে বেশি সার প্রয়োগের ফলে ধানগাছে পোকা ও রোগ আক্রমণ করে, পরিবেশের ক্ষতি হয় এবং কৃষকের লাভ কমে যায়। অধিকাংশ শত্রু

পোকার প্রজনন বা বংশবৃদ্ধির হার নির্ভর করে তাদের খাদ্যের মধ্যে থাকা এমাইনো এসিডের উপর। অতিরিক্ত সার গাছের শরীরে এইসব এমাইনো এসিডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে শত্রু পোকার ডিমের সংখ্যা, ডিম ফোটার হার ইত্যাদি বেড়ে যায়, যা সার্বিকভাবে শত্রু পোকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এর ফলে এসব শত্রু পোকাদের খায় এমন প্রাণিদের পক্ষে এদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া অতিরিক্ত ইউরিয়া সার প্রয়োগের ফলে ব্লাস্ট ও ব্লাইট রোগসমূহের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়।

এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ধান গাছ, মাটি ও পানি ব্যবস্থাপনার সমন্বয় করে এক কালি চারা রোপণ (এসআরআই) বা একটি করে ধানের চারা রোপণের পদ্ধতি ক্রমে জনপ্রিয় হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে একটি করে কমবয়সী চারা (সর্বোচ্চ ১৪ দিন বয়সী) তুলনামূলক বেশি ফাঁকা করে রোপণ করা হয় (১০ ইঞ্চি বা এর কাছাকাছি দূরত্বে)। এর ফলে ধানগাছের শেকড় ও শরীর বেড়ে উঠার জন্য প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে বেশি জায়গা পায়। তবে এক্ষেত্রে ধান ক্ষেতের মাটি ভেজা, ভালভাবে জল নির্গমন সুবিধা এবং জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ রাখতে হয়। এতে বাড়তি ঘাস নিয়ন্ত্রণের জন্য ধান চাষের প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু এতে বীজ (৭৫ ভাগ পর্যন্ত), সেচের পানি (৫০ ভাগ পর্যন্ত) এবং রাসায়নিক উপকরণ (১০০ ভাগ পর্যন্ত) কম লাগে। এভাবে ধান চাষ করলে ৫০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, যা নির্ভর করে মাটির গুণাগুণ ও কৃষকের দক্ষতা উপর। এসআরআই পদ্ধতি পরিবেশ-বান্ধব। এতে ধানগাছের স্বাস্থ্য তুলনামূলক ভালো থাকে এবং বালাইনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এছাড়া বন্যামুক্ত জমিতে জীববৈচিত্র্য বেশি থাকে এবং মিথেন নির্গমন হয় না।



ধানক্ষেতের মাটির পুষ্টির ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কম্পোস্ট ও সবুজ সার থেকে ধীর গতিতে নির্গত হওয়া পুষ্টি মাটির জৈবিক ভারসাম্য রক্ষা করে। কৃত্রিম ইউরিয়া সার প্রয়োগ না করা হলে মাটিতে নাইট্রেট কম থাকে এবং বালাই এর হার ও প্রকোপ কম হয়। এছাড়া বিভিন্ন ময়লাভুক পোকারা কম্পোস্টের জৈব পদার্থ খায়, যাদেরকে আবার ধান গাছের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে আসা শিকারী প্রাণিরা খেতে পারে।

নব্বই-এর দশকে "নির্দিষ্ট স্থানের পুষ্টি ব্যবস্থাপনা" (site specific nutrient management) গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পুষ্টি-চাহিদা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ছিল মাটিতে থাকা খনিজ সার ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গাছের জন্য সুষম পুষ্টির ব্যবস্থা করা। এর তিনটি ধাপ: (১) ধানের জাত, জলবায়ু, জমি, মৌসুম ও ফসল ব্যবস্থাপনা বিবেচনায় নিয়ে অর্জনযোগ্য উৎপাদন লক্ষ্য নির্ধারণ; (২) মাটিতে থাকা পুষ্টি, কম্পোস্ট সার প্রয়োগের মাধ্যমে যোগ করা পুষ্টি, পূর্ববর্তী মৌসুমের শস্যের অবিশষ্টাংশ, সেচের পানির প্রাপ্যতা এবং উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে সারের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ; এবং (৩) শস্যের প্রয়োজন এবং মাটিতে থাকা পুষ্টির পার্থক্য বিবেচনায় নিয়ে ঐ পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা ঠিক রাখা।

বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। চীনে দেখা গেছে, সময়মত এবং পরিমাণমত সার প্রয়োগের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। উত্তর ভিয়েতনামে ৮-১৫ ভাগ বেশি ফসল উৎপাদন হয়েছিল। বাংলাদেশে শুধুমাত্র উন্নত নাইট্রোজেন ব্যবস্থাপনার ফলেই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং মৌসুমে হেক্টরপ্রতি লাভের পরিমাণ ৫০ মার্কিন ডলার বেশি হয়েছিল। ধান চাষের উন্নত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুস্থায়ী ও পরিবেশ-বান্ধব কৃষি চর্চা সম্ভব।

ধানক্ষেতের ইকোসিস্টেমের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে এমন চর্চা বাদ দেওয়ার পাশাপাশি, জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি করার জন্য একই জমিতে ধানের জাতের সংখ্যা বাড়ানোর মাধ্যমে বালাই এর আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। বিশেষ করে বিভিন্ন বালাই-প্রতিরোধী জাত জমিতে রাখা উচিৎ। এছাড়া ধানক্ষেতে ধানগাছ ছাড়াও অন্য গাছ রাখা (ধইনচার মত), পাখি বসার জন্য কাঠি পুঁতে দেওয়া, পানি জমে থাকে এমন ছোট গর্ত রাখা ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রাণিরা আসতে ও বাসা তৈরি করতে পারে এবং ধানক্ষেতে প্রাকৃতিক-জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ধানক্ষেতের ছোট গাছে এবং ধানক্ষেত সংলগ্ন ঝোপ-ঝাড়ে মাকড়সার মত প্রাণিরা যারা সহজে এক জায়গা স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করে না থাকতে পারে এবং শত্রু পোকাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

ধানক্ষেতের চারপাশে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য উৎপাদন করলে এবং বিভিন্ন ধরনের ঘাস ও বুনোফুল থাকলে কৃষি-ইকোসিস্টেমের বৈচিত্র্য ও জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শত্রু পোকাদের নজর শুধুমাত্র ধানের উপর পড়ে না। জমির আইলে ঝোপ-ঝাড় থাকলে এবং ধানের প্রয়োজনমত সেগুলো ছেটে দিলে উপকারী পোকারা ধানক্ষেতে যায় এবং শত্রুপোকাদের প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। রসুন, গাঁদা, মোরগফুল ইত্যাদি গাছ শত্রু পোকাদের দূরে রাখে। যেসব প্রাণিরা ধানের শত্রু পোকাদের খায়, তাদের বাসা তৈরির জায়গাও ধানক্ষেতে বা সংলগ্ন জায়গায় রাখা দরকার। অর্থাৎ ছোট-বড় গাছ লাগানোর মাধ্যমে চাষের ক্ষেতের গঠনকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে বিভিন্ন রকমের পোকা, পাখি ও প্রাণিদের উপস্থিতি বাড়ে।

এছাড়া বন্ধু প্রাণিদের শস্যক্ষেতে নিয়ে আসার বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী কৌশল আছে। পূর্ব ইন্ডিয়ায় চাষীরা ক্ষেতে মাঝে মাঝে বোলতা বা মৌমাছির চাক স্থাপন করেন। তামিলনাড়ুতে চাষীরা প্রাকৃতিক বালাই ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে মাকড়সার বংশবৃদ্ধি করেন। অনেক এলাকাতে কৃষকরা উইপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য কালো ডেঁয়ো পিঁপড়া জমিতে নিয়ে আসেন। এরকম নানান ঐতিহ্যবাহী পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতি সংগ্রহ করে প্রয়োগ করা যায়।

ধানক্ষেতে মাছ ও হাঁস চাষের মাধ্যমেও বালাই দূর করা যায়। ধানক্ষেতে স্থানীয় মাছ চাষ করে কীটনাশক ও সারের ব্যবহার কমানো যায়। মাছ বিভিন্ন শত্রু পোকা ও তাদের ডিম খায়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অনেক আগে থেকেই বালাই দূর করার জন্য ধানক্ষেতে গৃহপালিত হাঁস ছেড়ে দেওয়ার চর্চা করা হয়। হাঁসের খাদ্য চাহিদা বেশি এবং ধানের শত্রু প্রাণিদের সংখ্যা দ্রুত কমাতে পারে। ফিলিপাইনে জমি প্রস্তুত করার শেষ পর্যায়ে এবং ফসল তোলার পর ছোট শামুক ও পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য হাঁস ছেড়ে দেওয়া হয়। চীনে ধানের চারা রোপণের সাত দিন পর হাঁসের ছানা ছেড়ে দেওয়া হয়। হাঁস শত্রু প্রাণি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ৯৮.৫-৯৯.৩ ভাগ ঘাস দূর করতে পারে। একসাথে ধান-হাঁস চাষের ফলে ধান গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। হাঁসের নড়াচড়ার ফলে ধানক্ষেতের পানিতে অক্সিজেন বেশি যায় এবং মিথেন গ্যাস নির্গমন কমে। এছাড়া ধানগাছের শেকড় ও শরীর শক্তিশালী হয়। হাঁসের মল জমিতে পুষ্টি যোগায়, ফলে কৃত্রিম সার ও বালাইনাশকের খরচ কমে। সর্বপোরি ঐ জমি থেকে গুণগত মানসম্পন্ন ধান ও প্রাণিজ আমিষ পাওয়া যায়।



ধান ও ডাল মিশ্র চাষ



উপসংহার

বাঙালীর ভাত ছাড়া চলে না। তাই উপরে ধানের নানা বিষয় ও পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ধান আবাদ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রক্রিয়ার সাথে যদি ধান চাষীদের চোখের পানি, রোগের মহামারি, জীববৈচিত্র্যের ঢালাও বিনাশ আর পরিবেশের ব্যাপক অবক্ষয়ের কলঙ্ক লেগে থাকে তা কাঙ্ক্ষিত নয়। যে প্রক্রিয়ায় হাজার হাজার স্থানীয় আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী জাত হারিয়ে আমরা কৃত্রিম উপকরণ ছাড়া চাষ করা যায় না এমন গুটিকয়েক জাতের উপর নির্ভরশীল হয়েছি, তার সুস্থায়িত্ব নিয়ে জোর বিতর্ক চলছে। কারণ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের আগে প্রয়োজন নির্মল বাতাস ও বিশুদ্ধ পানি। উপরের আলাপে আমরা জেনেছি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে এখন বিকল্প অন্বেষণ শুরু হয়েছে। খাদ্য, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ককে নতুনভাবে সাজানোর জন্য বলা হচ্ছে। তবে কৃষিখাতে 'খাদ্য নিরাপত্তা' নিয়ে রাজনীতির পর 'পুষ্টি নিরাপত্তা' ও 'জলবায়ু সহনশীলতা' নিয়ে রাজনীতি শুরু হয়েছে। জলবায়ু সংকটের জন্য দায়ী কোম্পানিগুলো এখন নতুন প্রেসক্রিপশন নিয়ে হাজির হচ্ছে। আমাদের কৃষকদের বীজের উপর কারিগরী করে সেসব বীজের প্যাটেন্ট নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রকৃতির জটিল জগত, জীববৈচিত্র্যের মধ্যে সম্পর্কের অনেক কিছুই এখনও আমাদের অজানা। অথচ জীবের জিন বিন্যাস পরিবর্তন করে প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এসব রাজনীতি যেন জনগণ বুঝতে পারেন এবং নীতি-নির্ধারকরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এজন্য কাজ করা জরুরি। কৃষির সাথে আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, যোগাযোগ, সংস্কৃতি ইত্যাদি নানান বিষয় জড়িত। তাই সকলেরই এসকল বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি। আর সুস্থায়িত্ব অর্জনের এই যাত্রায় পথ দেখাতে পারে আমাদের হাজার বছরের পরীক্ষিত ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও দক্ষতা।

উপরের আলাপের বিভিন্ন অংশে সুস্থায়ী ধান চাষের নানা কৌশলের কথা বলা হয়েছে। তবে এখানে নির্দিষ্টভাবে কিছু সুস্থায়ী কৌশলের কথা উল্লেখ করা হলো:

- মাটির যথাসম্ভব কম ক্ষতি করে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে জমি চাষ দেওয়া।
- ধানক্ষেতের ইকোসিস্টেমের সংহতি নষ্ট করে এরকম উপকরণ (কৃত্রিম রাসায়নিক সার, বালাইনাশক বিষ) প্রয়োজন হয় না এমন জাতের ধান আবাদ করা।
- জমির আবহাওয়া, মাটির বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ এবং পানির প্রাপ্যতা (যাতে মাটির নিচের পানি তুলতে না হয়) অনুযায়ী জাত আবাদ করা।
- একই ক্ষেতে যত বেশি সম্ভব ধানের জাত একসাথে আবাদ করা।
- বিভিন্ন বালাই-প্রতিরোধী (পোকা, রোগ, আবহাওয়া সহনশীল) জাত ধান ক্ষেতে রাখা।
- এসআরআই এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী পরীক্ষিত পদ্ধতি, ফসল বিন্যাস ইত্যাদি সংগ্রহ ও প্রচার করা।
- ধানক্ষেতে ও ক্ষেতের চারপাশে বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল চাষ করা।
- ধানক্ষেতে শত্রু পোকাদের দূরে রাখে এমন গাছ রাখা। ধানক্ষেতের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের ঘাস, ঝোপ-ঝাড় ও বুনোফুল রাখা। যাতে শত্রু পোকাদের আক্রমণ শুধু ধানের দিকে না যায়।
- ধানক্ষেতের বাড়তি ঘাস নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি ব্যবহার করা। গবেষণার মাধ্যমে এসকল ঘাসের গুণাগুণ, উপকারিতা ও ব্যবহার চিহ্নিত করা।
- ধানক্ষেতে ও ক্ষেতের চারপাশে পাখি, বন্ধু পোকা ও প্রাণিদের আবাসস্থল তৈরির জন্য অন্য গাছ রাখা, কাঠি পুঁতে দেওয়া (পার্সিং), পানি জমার মত ছোট গর্ত রাখা ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করা। অর্থাৎ ধানক্ষেতের জীববৈচিত্র্য লালন ও সমৃদ্ধ করা। যাতে ধানক্ষেতে প্রাকৃতিক-জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং শত্রু পোকা ও বালাই এর আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায়।
- প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে তৈরি কম্পোস্ট, সবুজ ও অণুজীব সার প্রয়োগ করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও অণুজীব বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করা।
- প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে তৈরি জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করা।
- গ্রামের জীববৈচিত্র্য লালন ও সমৃদ্ধ করা, যাতে তারা চাষের ক্ষেতের শত্রু প্রাণিদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।
- সঠিকভাবে বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষেতে চাষ করা সকল জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা (সংযুক্তি ১ এ দেখুন)।
- পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ করা। এসময় চালের পুষ্টিগুণ যেন নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
- ধান থেকে স্থানীয়ভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য উৎপাদন করা এবং সেসকল খাদ্য জনপ্রিয় করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।

- ভাত রান্না করার সময় চালের পুষ্টি উপাদান যেন না চলে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা ।
- আমাদের দেশে পাওয়া যায় এমন সকল ধানের পুষ্টি এবং অন্যান্য গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত ও প্রচার করা ।
- কৃত্রিম উপকরণ ছাড়া সুস্থায়ী পদ্ধতিতে চাষ করা যায় এমন ধানের বীজ সহজলভ্য করা ।
- ধানচাষ যেন কৃষকের জন্য লাভজনক থাকে এজন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা, ব্যবস্থাপনা, কৃষি জমি ও সম্পদে প্রবেশাধিকার এবং কৃষকদের সাংবিধানিক অধিকার (বিশেষত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) নিশ্চিত করা ।
- দানা শস্যের জন্য শুধু ধানের উপর নির্ভর না করে গম, ভূট্টা, যব, কাউন ইত্যাদি দানাশস্যের কৃত্রিম উপকরণমুক্ত চাষ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা ।
- সর্বপোরি কৃষির উপর কৃষক এবং কমিউনিটির অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা ।



সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আব্‌দুল বায়েস এবং মাহবুব হোসেন, তিন বিঘা জমি, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০১৩

আমাদের ধানবৈচিত্র্য, নয়াকৃষি আন্দোলন, ২০১৫ (http://ubinig.org/index.php/nayakrishidetails/showAerticle/11/25/bangla)

আলি নওয়াজ, খনার বচন কৃষি ও কৃষ্টি, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১

জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস, আউশ আমন বোরো ধান বিষয়ক কথকতা, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস, জলবায়ু এবং ধান বিষয়ক কথকতা, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস, সময়ের আবর্তে কৃষি, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস, ধান এবং সাধারণ কিছু কথাবার্তা, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

দেবল দেব, লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি, উৎস মানুষ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০০

ধানের পাঁচটি রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর, ২০০৭

বাংলাদেশের কৃষিপ্রাণবৈচিত্র্য, বারসিক, ঢাকা, ২০১২

ব্রি ধানের জাত পরিচিতি, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর

মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, ফসলের জীববৈচিত্র্য ও জিন সম্পদ, প্রান্ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫

মৃত্যুঞ্জয় রায়, ধানের রোগ, প্রান্ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সান্যাল ও অনার্য তাপস সম্পাদিত, বাংলা ও বিশ্বের খাদ্য বৈচিত্র্যের উৎস, নুনেতে ভাতেতে, কলকাতা, ২০১৭



তথ্যসূত্র

১. http://ricepedia.org/rice-as-food/the-global-staple-rice-consumers

২. http://ricepedia.org/rice-as-commodity/international-rice-market-trade

৩. http://ricecrp.org/importance-of-rice/

৪. http://www.worldstopexports.com/rice-exports-country/

৫. http://www.worldstopexports.com/rice-imports-by-country/

৬. Borromeo, E. Deb, D. 2006. Future of Rice. Greenpeace International. Amsterdam, The Netherlands. p 5

৭. Borromeo, E. Deb, D. 2006. Future of Rice. Greenpeace International. Amsterdam, The Netherlands. p 5

৮. Borromeo, E. Deb, D. 2006. Future of Rice. Greenpeace International. Amsterdam, The Netherlands. p 5

৯. Borromeo, E. Deb, D. 2006. Future of Rice. Greenpeace International. Amsterdam, The Netherlands. p 5

১০. দেবল দেব, লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি, উৎস মানুষ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা ৪

১১. http://www.brri.gov.bd/site/page/8b7380c8-cf5c-4d48-abe5-2573cfe43b10/%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF

১২. দেবল দেব, পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা ১-৬

১৩. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, ফসলের জীববৈচিত্র্য ও জিন সম্পদ, প্রান্ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৯-২৩

১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯-২৮

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৯-৩৪

১৬. আলি নওয়াজ, খনার বচন কৃষি ও কৃষ্টি, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৩১-৪০

১৭. আকবর আলি খান, 'সোনার বাংলা'য় দারিদ্র্য, প্রথম আলো ঈদসংখ্যা ২০১৯, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৬৭

১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭

১৯. http://brri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brri.portal.gov.bd/page/19314eee_5fb5_48c3_801e_cc2f40c0d579/About_BRRI.pdf

২০. দেবল দেব, পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা ৪-৫

২১. http://brri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brri.portal.gov.bd/page/b6531346_66a5_45e7_9cb0_d00c7c7009dc/Rice%20Area%2C%20Production%20and%20Yield%20in%20Bangladesh_29.01.2019.pdf

২২. পূর্বোক্ত

২৩. http://brri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brri.portal.gov.bd/page/b6531346_66a5_45e7_9cb0_d00c7c7009dc/Export%20and%20Import%20Rice%20data%20of%20Bangladesh%2020.03.2019.pdf

২৪. দেবল দেব, পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা ৬-৮
২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯-১০
২৬. আব্দুল বায়েস এবং মাহবুব হোসেন, তিন বিঘা জমি, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৭
২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪
২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৯, ১৪৫
২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮
৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮১
৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩
৩২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৪
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭ এবং ৪৩
৩৫. দেবল দেব, পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা ৭
৩৬. https://www.bb.org.bd/openpdf.php
৩৭. https://www.greenfacts.org/en/agriculture-iaastd/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Assessment_of_Agricultural_Knowledge,_Science_and_Technology_for_Development
৩৮. http://www.agrinews24.com/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87/?fbclid=IwAR0jAoSqqMGvx8TQkpPq_p9QJYKYzc0ZNWNZqMzasRAdwy3nD4JfvZXqslY (25 November 2019)
৩৯. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, রসট্রাম থেকে, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা ৫০
৪০. মৃত্যুঞ্জয় রায়, ধানের রোগ, প্রান্ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৭
৪১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩
৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩
৪৪. অনুবাদঃ Borromeo, E. Deb, D. 2006. Future of Rice. Greenpeace International. Amsterdam, The Netherlands. p 6
৪৫. অনুবাদঃ Borromeo, E. Deb, D. 2006. Future of Rice. Greenpeace International. Amsterdam, The Netherlands. p 8-12
৪৬. অনুবাদঃ Borromeo, E. Deb, D. 2006. Future of Rice. Greenpeace International. Amsterdam, The Netherlands. p 12
৪৭. https://www.daily-sun.com/arcprint/details/222815/2017/04/29/Nutraceutical-Aspects-ofRice:-BRRI-Perspective/2017-04-29
৪৮. https://www.irri.org/safe-and-healthy-rice
৪৯. http://www.knowledgebank.irri.org/training/fact-sheets/postharvest-management/item/brown-rice-fact-sheets
৫০. http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=128

৫১. https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/glycemic-index-and-glycemic-load-for-100-foods

৫২. http://brri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brri.portal.gov.bd/page/de67726d_689e_4b72_b8c4_89c90635842f/Factsheet9-BRRI%20dhan29_.pdf (01/12/2018)

৫৩. http://fpmu.gov.bd/agridrupal/content/screening-nutritionally-rich-and-low-glycemic-index-bangladeshi-rice-varieties

http://www.academicjournals.org/app/webroot/article/article1380728819_Fatema%20et%20al.pdf

৫৪. https://www.thedailystar.net/city/wait-almost-over-beta-carotene-rich-golden-rice-release-in-bangladesh-1531684

৫৫. http://cintdis.org/vrihi/

৫৬. http://www.currentscience.ac.in/Volumes/109/03/0407.pdf

৫৭. http://brri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brri.portal.gov.bd/news/7da84f97_d3d2_4677_9e1d_41396808d3a5/BRRIdhan62.jpg

৫৮. http://ubinig.org/index.php/nayakrishidetails/showAerticle/11/25/bangla

৫৯. অনুবাদঃ Borromeo, E. Deb, D. 2006. Future of Rice. Greenpeace International. Amsterdam, The Netherlands. p 13-17



সংযুক্তি ১
ধানের চরিত্র ডকুমেন্টেশন

ধানের জাতের নাম: মৌসুম: আমন/ বোরো/ আউশ **ধান ও চালের নমুনা:**

কৃষকের নাম: মোবাইল: গ্রাম: জেলা:

যে কৃষকের কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

*বীজ সংগ্রহ করার সময় ঐ জাত কোন জমি বা পরিবেশের উপযোগী এবং চাষ পদ্ধতি জেনে নিতে হবে।

বীজতলায় বীজ ফেলার তারিখ

চারা রোপণের তারিখ

প্রতি গোছায় চারার সংখ্যা

ধানের ফুল আসার তারিখ

ধান কাটার তারিখ

ধানের জীবনকাল (দিন)

জমির প্রকার (উঁচু/ নিচু/ মাঝারী)

জমির পরিমাণ (শতক)

ধান উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)

প্রতি শতকে উৎপাদন (কেজি/শতক)

খড়ের দৈর্ঘ্য (৩টির গড়)

প্রতি কেজি ধানে চালের পরিমাণ

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন বা লিখুনঃ

১.	প্রথম পত্র বেষ্টনীর রং (অঙ্কুরোদগম হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে)	১. সবুজ	২. লালচে	৩. সবুজের মধ্যে বেগুনী ছোপ	
২.	পাতার রং (রোয়ার ৭- ১০ দিনের মধ্যে)	১. লাল নেই	২. ডগাতে লাল	৩. দুই কিনারে লাল	৪. পাতায় লাল ছোপ
৩.	গিঁটে রোম/ গোঁফের উপস্থিতি (রোয়ার ৩০ দিন পর)	১. গিঁট নেই	২. গিঁট আছে রং:		
৪.	সর্বচ্চো পাতার কোণ (রোয়ার ১- ১.৫ মাস পর, যখন সব গাছের শীষ বের হয়েছে)	১. একদম খাড়া	২. একটু হেলে গেছে	৩. মাটির সমান্তরাল	৪. মাটির দিকে হেলে গেছে
৫.	পাতার মাপ: ৩ টি গাছের পাতার গড় (চাল হচ্ছে এসময়, দ্বিতীয় পাতার মাপ)	১. দৈর্ঘ্য:	২. প্রস্থ:	৩. দৈর্ঘ্য- প্রস্থের অনুপাত:	
৬.	গর্ভের অবস্থা (যখন সব ধান পেকে গেছে)	১. গর্ভের ভেতর বেশ কিছু শীষ	২. কিছু অংশ গর্ভের ভেতর, বোটা দেখা যাচ্ছে না	৩. বোটা একটু বের হয়েছে	৪. বোটা পুরোটা বাইরে

৭. শীষের কোণ	১. খাড়া	২. তেরছা বা একটু হেলে আছে	৩. একদম নুয়ে পড়েছে		
৮. শীষের শাখা- প্রশাখা	১. প্রশাখা নেই	২. খুব কম প্রশাখা আছে (সবগুলোতে নেই)	৩. প্রশাখা আছে দলা দলা	৪. প্রশাখা আছে,	
৯. শুঁয়ার উপস্থিতি	১. নেই	২. শীর্ষভাগের কয়েকটি ধানে আছে	৩. ৪ ভাগের ২ ভাগে আছে	৪. ৪ ভাগের ৩ ভাগে আছে	৫. সব ধানেই শুঁয়া আছে
১০. শুঁয়ার রং	১. নেই	২. খড় রং	৩. সোনালী	৪. বেগুনী	৫. কালো
১১. ধানের রং (সকাল ১১ টার মধ্যে দেখতে হবে)	সাদা	খড়	সোনালী রেখা	বাদামী/ খয়েরী	বাদামী/ খয়েরী ছোপ	বাদামী রেখা
	লাল থেকে হালকা বাদামী	বেগুনী	বেগুনী ছোপ	বেগুনী রেখা + খালে কালো	কালো	
১২. ধানের দৈর্ঘ্য (১০ টি ধানের দৈর্ঘ্যের গড়: মিলিমিটার)					
১৩. ধানের প্রস্থ (১০ টি ধানের প্রস্থের গড়: মিলিমিটার)					
১৪. চালের রং (ধানের মত)					
১৫. চালের দৈর্ঘ্য (১০ টি চালের দৈর্ঘ্যের গড়: মিলিমিটার)					
১৬. চালের প্রস্থ (১০ টি চালের প্রস্থের গড়: মিলিমিটার)					
১৭. ধানের বা চালের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য					

২০১৮ সালের ২১-২৫ এপ্রিল তারিখে নীলফামারীতে রিইব-আরএলএস আয়োজিত জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি বিষয়ক আবাসিক স্কুলে ইন্ডিয়ার সেন্টার ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারী স্টাডিজ এর প্রধান ড. দেবল দেব কর্তৃক প্রদত্ত লেকচারের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ।



RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, useful, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research (*Gonogobeshona*) on the development schemes that affects them most, in order to develop ownership and generate community mobilization.

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material. For more information please visit : www.rosalux.in